“নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি”

Safe Food
Smart Bangladesh

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩

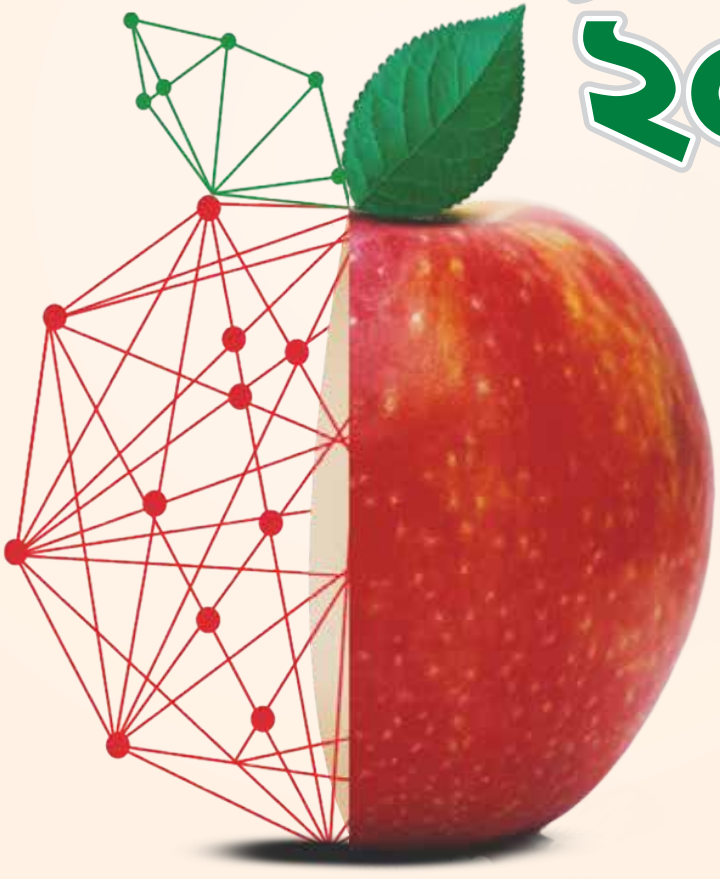

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"

Safe Food
Smart Bangladesh

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩

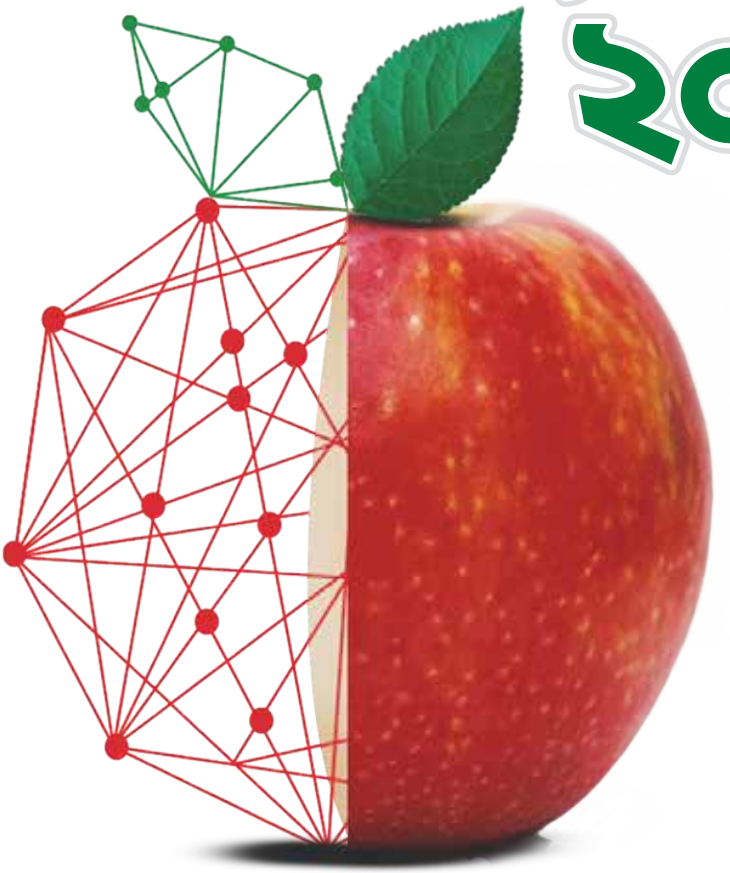

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে,
আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের
অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

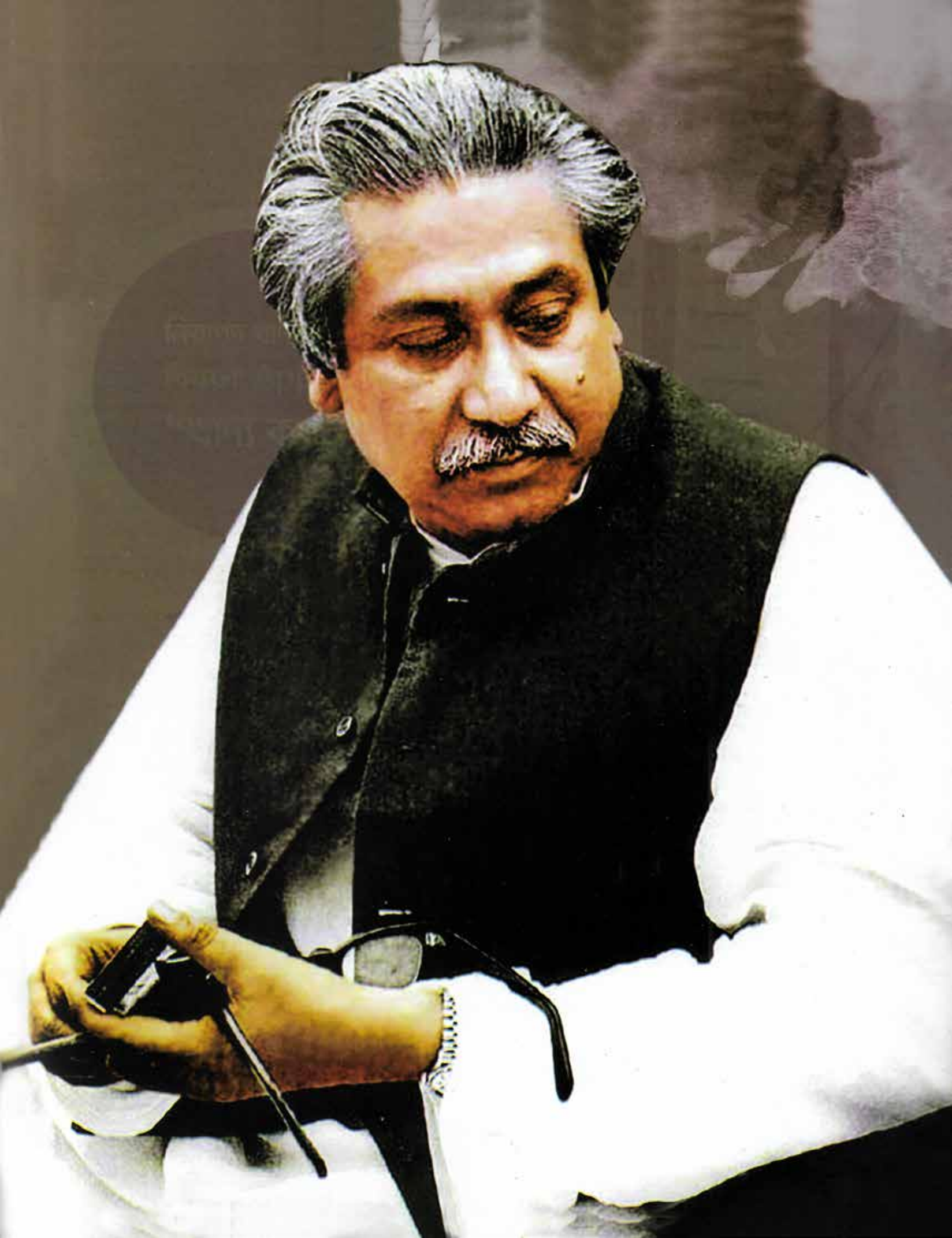

“উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সুস্থ সবল জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই।”

-শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

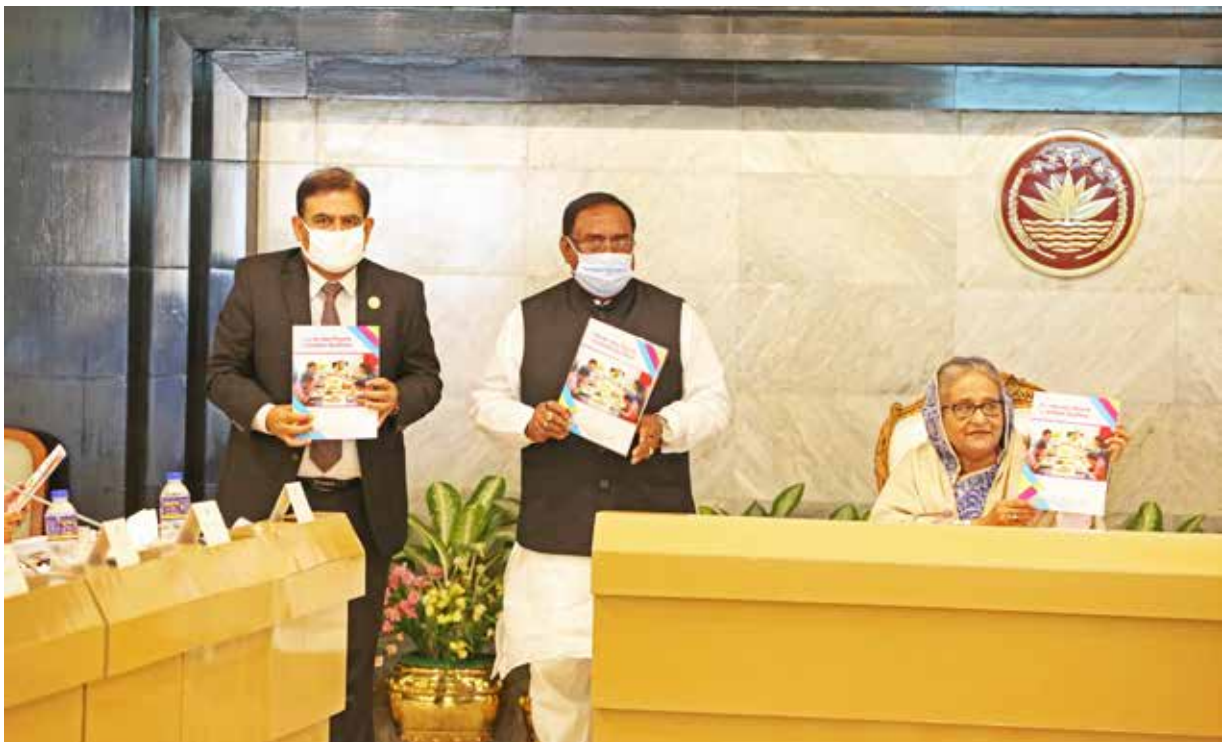

১২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' উদ্বোধন করেন।

“নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি”

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩

স্মরণিকা

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রকাশকাল

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ডিজাইন

এফআর প্রিন্টিং
ছাদিকুর রহমান রিপন
মোবাইল: ০১৬৮০ ৮৭৮ ১৮৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মো. আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদনা পরিষদ

১	**জনাব মোঃ রেজাউল করিম** সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	আহবায়ক
২	**প্রফেসর ড. আব্দুল আলীম** সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৩	**জনাব আব্দুন নাসের খান** সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৪	**জনাব রকিবুল হাসান** উপপরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৫	**জনাব সুমেন মজুমদার** বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৬	**জনাব এসএম শিপন** গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৭	**জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান** মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৮	**জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন** মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৯	**জনাব মোঃ তাইফ আলী** গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
১০	**জনাব তানজীম আহাম্মদ** সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
১১	**জনাব আবুল হাসনাত** জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য সচিব ও সম্পাদক

উৎসর্গ:

করোনাকালীন শহীদদের...

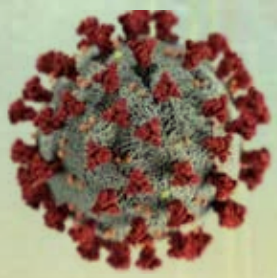

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৯ মাঘ ১৪২৯
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

দেশে'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য **"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"** অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার(এসডিজি) একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্তত ৭টি লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত। জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। অনিরাপদ খাদ্যগ্রহণের কারণে দেহে ক্যান্সার, কিডনি রোগসহ নানারকম মরণব্যাধি বাসা বাঁধে। নিরাপদ খাদ্যের জন্য খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠনে নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ১৩টি বিধিবিধান তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি আশা করি দেশের খাদ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীসহ সমাজের প্রত্যেকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। মেধা ও মননে উৎকর্ষ ও কর্মক্ষম একটি জাতি গঠনে সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করাই হোক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ মাঘ ১৪২৯
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য "নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি" যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান আমাদের সংবিধানে মৌলিক বিষয়গুলি যেমন: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেখানে খাদ্যটাকেই সব থেকে বেশি তিনি গুরুত্ব দেন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাতির পিতা এ দেশে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা ও কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন যা আজ পর্যন্ত দেশের কৃষির উৎপাদন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। মানুষের এই অধিকার পূরণ করতে আমাদের সরকার 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' প্রণয়ন করেছে এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০১৫ প্রতিষ্ঠাসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান তৈরি করেছে। পাশাপাশি ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে অন দ্যা স্পট স্ক্রিনিং, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে এবং যারা খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টা মাথায় রেখে 'কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের সরকার সারাদেশে ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছে যেখানে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে ওঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি অর্জনে কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়ন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি সম্প্রসারণ, সেচ কাজে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলা , প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এই ৬টি থিম্যাথিক বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একই সাথে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার সার, বীজ ও সেচের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের উপর ব্যাপক জোর দিয়েছে। এতে করে খাদ্যের অপচয় এবং অনিরাপদ খাদ্যের ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে এবং যার যেটুকু পতিত জমি আছে তা চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমি মনে করি, খাদ্যের উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিমান বজায় রাখা জরুরি। যিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, তার যেমন সচেতনতা প্রয়োজন; তেমনি যিনি ভোগ করবেন, তার ক্ষেত্রেও নিরাপদতা প্রত্যয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সরকারি-বেসরিকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমি আশা করি, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনদের প্রায়োগিক ভূমিকার মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মত এবারও 'নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য "নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে ›সোনার বাংলা' বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিতে অগ্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে কৃষি উন্নয়নের যে ভিত্তি রচিত হয়েছিল, সেটিকে অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষিবান্ধব নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে বিগত ১৪ বছরে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা প্রদান এবং আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। এছাড়া, পুষ্টিখাতকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি, ২০২০' এবং 'জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫'-সহ বিভিন্ন সেক্টরল পলিসির আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস -২০২৩ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মন্ত্রী

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল। দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি' যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। যথাযথভাবে এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দরিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। করোনা মহামারীতে সারা বিশ্ব যেখানে বিপর্যস্ত ছিলো, সেখানে বাংলাদেশ সকল সূচকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। খাদ্য উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। একটি টেকসই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৩ সালে প্রণীত 'নিরাপদ খাদ্য আইন' বাংলাদেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তিতে একটি মাইলফলক। এই আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে সরকার 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ে লোকবল নিয়োগ করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে অপুষ্টির ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। কিন্তু পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে এখনও বহু মানুষ অপুষ্টিসহ নানাবিধ রোগ-ব্যাধির শিকার হয়ে জীবনযাপন করছে; যা সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এক বিরাট অন্তরায়।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত সর্বস্তরের অংশীজনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রগতির জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি '**জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩**' উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন, এমপি

মন্ত্রী

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

‘‘নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি’’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ষষ্ঠবারের মতো ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ ২০২৩ উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্জনে এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ দিবস উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদাপূরণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। যথাযথভাবে এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দরিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। একটি টেকসই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকল্পে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো “নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩” প্রণয়ন এবং এর আওতায় খাদ্য পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি “বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ” প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সীমিত জনবল নিয়েই খাদ্যে ভেজালবিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনগণ উন্নত বিশ্বের সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছায় গৃহীত এসব পদক্ষেপসমূহ খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারসহ দেশবাসীর মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে অনুষ্ঠিতব্য “জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি “জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩” এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

মন্ত্রী

মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

“নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ষষ্ঠবারের মতো ’জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’-এ রূপান্তরে এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দিবসটি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই লক্ষ্য পূরণে সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি গঠন আবশ্যক। এ জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির কোন বিকল্প নেই। দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস ও প্রাণিসম্পদ। পাশাপাশি এ খাত রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে নিরাপদ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরাপদ ও মানসম্মত মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও সরবারহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নানা কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করেছে। নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রণয়ন করা হয়েছে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য মাননিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২০। এছাড়াও মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০, মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করা হচ্ছে। একইসাথে নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য উৎপাদনে সম্প্রতি দেশে আর্ন্তজাতিকমানের প্রাণিজসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকল্পে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো “নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩” প্রণয়ন এবং এর আওতায় খাদ্য পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি “বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ” প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সীমিত জনবল নিয়েই খাদ্যে ভেজালবিরোধী প্রচারাভিযান পরিচালনাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। যা ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছায় গৃহীত এসব পদক্ষেপসমূহ খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারসহ দেশবাসীর মাঝে তুলে ধরার প্রয়াসে অনুষ্ঠিতব্য “জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি “জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩” এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শ ম রেজাউল করিম, এমপি

সভাপতি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

“নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি”-প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ ফেব্রুয়ারি পালিত হতে যাচ্ছে ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’। সময়ের চাহিদা এবং সার্বিক বহুমাত্রিকতায় বর্তমান প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত উপযোগী।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের মানুষ যাতে তিনবেলা পেট ভরে খাবার পায়। স্বপ্ন পূরণের আগেই ঘাতকের বুলেটে তছনছ হয়ে যায় তাঁর দেহাবয়ব। সেই অধরা স্বপ্ন নিজের স্বপ্নের সাথে একীভূত করেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দক্ষ হাতের নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তা ও দৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পারেন খাদ্যের নিরাপত্তার পাশাপাশি এখন সময় এসেছে খাদ্য নিরাপদতার। এ কারণেই ২০১৩ সালে ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩’ আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সেই আইন কার্যকর হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে ঠিক তার পরের দিন, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

আজ সারা বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কার্যালয় রয়েছে, প্রতিটা জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য অফিসার। জনসচেতনতা ও নিরাপদ খাদ্যের প্রচারণা ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে। পারিবারিক নিরাপদ খাদ্য নির্দেশিকা, খাদ্যবার্তা নামে ত্রৈমাসিক প্রকাশনা, খাদ্যকথন ও নজর অ্যাপ, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক টিভিসি প্রচার, গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ, সেমিনার, কর্মশালা, উঠান বৈঠক, জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার, বস্তিদের নিয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি, মনিটরিং, মোবাইল কোর্ট, নিয়মিত খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন এবং গবেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সপাটে এগিয়ে চলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে।

আমি খুবই আনন্দিত যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দিবস উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রকাশনাটির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানা যাবে। খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য যেন আলাদা কোন বিষয় না হয়, খাদ্য বলতেই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য। এই কামনায় ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

দীপংকর তালুকদার, এমপি

সচিব

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের প্রত্যয় নিয়ে প্রতিবছরের মত এই বছরও উদযাপিত হতে যাচ্ছে **'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩'**। এবারের নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"** যা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ২০৪১ সালের প্রণীত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে খুবই প্রাসঙ্গিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিক নির্দেশনায় খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করছে। খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করছে। জনসচেনতা বৃদ্ধির জন্য সভা-সেমিনার অনুষ্ঠান, লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ, টিভি স্পট ও পথ নাটক প্রচারসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে 'পারিবারিক নিরাপদ খাদ্য নির্দেশিকা' নামক একটি বই প্রকাশের মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হোটেল-রেস্টুরেন্টে 'নজর অ্যাপস' ও 'টেম্পারেচার ডাটালগার' স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং করা হচ্ছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬ প্রনয়ণ করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতার সঠিক মান নির্ধারণ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ১৩টি বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশে নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একটি বহুপক্ষীয় চলমান কার্যক্রম। এজন্য খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্যগ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তর তথা- উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিপণন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও এর গুরুত্ব সর্ম্পকে সচেতন করা আবশ্যক। নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপন এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলন ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরণের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের ভরসার স্থল এবং খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর "এপেক্স বডি" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

আমি **'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩'**এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের প্রত্যয় নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ষষ্ঠ বারের মত পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। এবারের নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি" যা দেশের অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক নানান মাত্রিকতায় অত্যন্ত উপযোগী এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য প্রাসঙ্গিক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সুখী- সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি। শুধু তাই নয়, রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জন হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচক্ষণতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের পর ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের পরিণত করার ঘোষণা দেন যার মূল স্তম্ভগুলো হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নেন্স এবং স্মার্ট সোসাইটি। এ কথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উন্নত বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল ভূমিকা পালন করবে সুস্থ এবং কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ। খাদ্যের মান ও নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

সীমিত জনবল নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মিতভাবে খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচারণাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। দেশের প্রতিটি জেলায় খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সেমিনার, স্থানীয় পর্যায়ে গৃহিণীদের নিয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ একটি টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠনকে কেন্দ্র করে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২৬ বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। দেশে খাদ্যের নিরাপদতার কার্যকর মান নির্ধারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিরাপদতার মানসমূহকে দেশে প্রচলিত মানসমূহের সাথে সমন্বয় করে Standard Harmonization করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত ২৬টি কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পারিবারিকভাবে খাদ্যের নিরাপদতার চর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষ 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে এবং দেশব্যাপী স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এক লক্ষ পরিবারের নিকট এটি বিতরণ করা হচ্ছে এবং পনেরো হাজার পরিবারকে এই নির্দেশিকার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ খাদ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে যাচাইয়ের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতার নিশ্চয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি নিরাপদ খাদ্য যথাযথভাবে সচেতন এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রদানে ২০২৩ সালের প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একটি বহুপক্ষীয় চলমান কার্যক্রম। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত তথা স্মার্ট দেশের কাতারে পদার্পণে এবং বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতির উন্নয়ন ও কৃষিজ খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং সুস্থ জাতি গঠনের অভীষ্টকে সামনে নিয়ে জনসাধারণের খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে চর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩'- সকলের সক্রিয় সম্পৃক্ততা কামনা করছি।

মো: আব্দুল কাইউম সরকার

সদস্য

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ও

আহবায়ক, প্রকাশনা উপ-কমিটি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা মতে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ৩৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন এরও বেশী। করোনার মধ্যে বৈশ্বিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। আজ একদিকে যেমন খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে, অন্য দিকে মানুষের স্বাস্থ্যসমস্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতি বছর প্রায় ৬০ কোটি মানুষ শুধু দূষিত খাবার খেয়ে অসুস্থ হন। বাংলদেশে প্রতি বছর ৬৭ ভাগ মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনিরাপদ খাদ্য। ডায়রিয়া থেকে শুরু করে ক্যান্সার- এমন দুই শতাধিক রোগের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী অনিরাপদ খাবার। অনিরাপদ খাদ্যজনিত রোগের কারণে মানুষের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় যার ফলে বাংলাদেশ ২০১৬ সালে ১.৮ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয় মর্মে বিশ্বব্যাংকের ২০১৮ সালে প্রকাশিত “The Safe Food Imperative” শীর্ষক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিলো একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার। জাতির পিতার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার সাহসী ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক খাদ্য বাজারে প্রবেশের প্রত্যয়ে নিরাপদ খাদ্যের দেশে রুপান্তরে অংগীকারাবদ্ধ। এলক্ষ্যে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রণীত হয় যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। সে সময় থেকে ২ ফেব্রুয়ারি তারিখটি শুধুম হয়ে উঠে নিরাপদ খাদ্যের পরিচয়বহনকারী রূপে। তারই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠবারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩।

জাতীয় পর্যায়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, টেলিভিশন টক-শো, সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনা ও স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনের নিমিত্তে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, খাদ্য সচিব মহোদয়ের বাণী এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের মুখবন্ধ স্মরণিকাটিকে বিশেষভাবে মূল্যবান করেছে। সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ স্মরণিকা যাঁদের বিজ্ঞানমনস্ক লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। যে সকল খাদ্যপ্রতিষ্ঠান স্মরণিকা প্রকাশে আমাদের সহযোগী হয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপ-কমিটি (প্রকাশনা) এর সদস্যগণ প্রকাশনা কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০৪১ সালের মধ্যে SMART বাংলাদেশ গড়তে নিরাপদ ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিগত নির্বাচনী ইশতিহারে পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ঘোষণা একটি জাতির দিন বদলের দর্শন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতুলনীয় নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, ¬জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৩’’ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মো: রেজাউল করিম

জনসংযোগ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

সম্পাদকীয়

সাতই মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৪ বছরের অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তুলেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত তর্জনী। যে তর্জনীতে তিনি ইশারায় এঁকেছিলেন শোষণ বঞ্চনাহীন এক সমাজ; ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত এক স্বপ্নভূমি; সুখী সমৃদ্ধির নৌকায় এগিয়ে যেতে থাকা এক স্বপ্নীল লাল সবুজের বাংলার।

তর্জনী সঠিক মহিমায় গর্জন করার আগেই তিনি এবং তাঁর সোনার বাংলা হোঁচট খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে পড়েন কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের মশাল দিয়ে দিলেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এঁর হাতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মমতামাখা পরশে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা দানাদার খাদ্য উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ; কিন্তু খাদ্যে ভেজাল রোধ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য দরকার ছিলো একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বাসনায় প্রণয়ন হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্যের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ২০১৮ সাল থেকেই প্রতিষ্ঠার দিনটিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য যে কোন দেশের জন মানবশক্তির মূল নিয়ামিক। সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম সাঁকো হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে সম্পদকে দক্ষ করবার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ও খাদ্যে নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে বিগত বছরের ন্যায় এবারও ‘স্মরণিকা’ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অসীম বাসনা ও স্বল্প সাধ্য নিয়ে, সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা এ দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলাম। অসংখ্য সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও প্রকাশনা উপ-কমিটির প্রতিটি সদস্যের নিরলস প্রচেষ্টায় স্মরণিকাটি সফলতার বদন দেখতে পেয়েছে, তাতে আমরা ভীষণ আনন্দিত।

প্রকাশনাটিকে তথ্য, তত্ত্ব ও প্রাসঙ্গিকতায় সমৃদ্ধ করতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিলো না। গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, খাদ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ও আগ্রহী পাঠকমহলসহ সকলের জন্য বইটি সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। গুণগত মান বজায় রাখার ব্যাপারে সর্বাত্নক আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের অভাব ছিল না। তারপরও বানানজনিত ভুল, অবকাঠামোগত বিন্যাস, মুদ্রণজনিত ত্রুটি এবং অন্যান্য অনেক ভুল হয়তো আমরা দূর করতে পারিনি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাঁরা স্মরণিকার জন্য নিবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বইটিতে প্রকাশিত কোন নিবন্ধের তথ্য ও মতামত একান্তই লেখকের। তারপরও কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা বা অসামঞ্জস্যতা অথবা ভুল তথ্য থাকলে তার দায় একান্তই আমাদের।

স্মরণিকাটি প্রকাশের পেছনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর প্রচেষ্টা ছিলো বর্ণনাতীত। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম স্যার, আহবায়ক, প্রকাশনা কমিটি-এর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ ও প্রশংসিত। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের তীব্র বাসনা ও অনন্য উৎসাহ স্মরণিকা প্রকাশের কার্যক্রমকে আরো গতি দান করেছে। আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আবুল হাসনাত

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০১	সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ: লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ	মো. আব্দুল কাইউম সরকার	২৭
০২	গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্ময়কর রূপান্তর ও খাদ্য নিরাপত্তা	ড. আতিউর রহমান	৩৬
০৩	Nuclear and isotopic techniques in achieving food safety in Bangladesh	Dr. Mirza Mofazzal Islam Dr. Md. Rafiqul Islam Md. Nazmul Hasan Mehedi Abu Sayeed Md. Hasibuzzaman	৩৯
০৪	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন	ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ আসমা জামান	৪১
০৫	বঙ্গবন্ধুর চেতনায় টেকসই উন্নয়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি	ড. অনিমা রাণী নাথ	৪৩
০৬	অংশীদারিত্বঃ নিরাপদ খাদ্য বাস্তবায়নে একটি সম্ভাবনাময় দিগন্ত	মোস্তাক হাসান মো. ইফতেখার	৪৬
০৭	বাংলাদেশের লবণ শিল্প: সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা	প্রফেসর ড. আব্দুল আলীম	৫০
০৮	ব্রয়লার ও নেতিবাচক বাঙ্গালি	প্রফেসর ড. খান মো: সাইফুল ইসলাম	৫৫
০৯	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতাঃ প্রেক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ	প্রফেসর ড. এ. কে. ওবাদুল হক	৫৮
১০	Indiscriminate use of Harmful Chemicals in Fruits and Their Effects on Human Health	Dr. M. A. Rahim	৬০
১১	Nanoparticles as an alternative to Antibiotics	Professor Md. Abdul Kafi Aminur Rahman	৬৪
১২	Importance of Quality Control Laboratories (QCLs) and present condition of some QCLs. in food and agricultural sector of Bangladesh	Mohammed Ariful Islam	৬৮
১৩	কাচ্চির সাথে বোরহানি খাবার আগে প্রশ্ন তুলুন!	প্রণব সাহা	৭০
১৪	সুখাদ্য	সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা	৭২
১৫	নীরব ঘাতক উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে প্রয়োজন পরিমিত লবণ গ্রহণ	অধ্যাপক সোহেল রেজা চৌধুরী	৭৪
১৬	Food safety and Food Microbiology	Dr. Sahadev Chandra Saha	৭৬

ক্রমিক	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১৭	নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ: বর্জ্য ও উচ্ছিষ্ট খাবার ব্যবস্থাপনা	কাওসারুল ইসলাম সিকদার	৮২
১৮	নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনে চাই সমন্বিত উদ্যোগ	রেজাউল করিম সিদ্দিক	৮৫
১৯	icddr,b and BFSA joint undertaking reduced turmeric adulteration by lead chromate in Bangladesh.	Dr. Md. Mahbubur Rahman & Dr. Musa Baker	৮৭
২০	Food Safety aspects in Bangladesh	Dr. Barun Kanti Saha	৮৯
২১	নিরাপদ ও উৎকৃষ্টমানের ফ্রাইড চিপ্স পণ্য উৎপাদনে ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং প্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা	ড. মো: গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী এবং মো: হাফিজুল হক খান	৯১
২২	Concentration, source identification and potential human health risk, assessment of heavy metals in chicken meat and egg in Bangladesh	Shamshad B. Quraishi Mohammad Mozammal Hosen & AKM Atique Ullah	৯৩
২৩	Food Security and Safety for Healthy Lives	Dr. Abu Hashem	৯৮
২৪	পোল্ট্রির মাংসে ক্ষতিকর স্বাস্থ্যগত প্রভাব নির্ণয়ে পরীক্ষাসমূহ	ড. সাবিহা সুলতানা	১০০
২৫	Aspect of nutraceutically enriched rice based bakery food products in Bangladesh.	Dr. Muhammad Ali Siddiquee	১০৩
২৬	শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মানোন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের ভুমিকা	ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া	১০৫
২৭	Preventive Food Control System: How we can think?	Md. Masud Alam	১০৭
২৮	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ	সাইফুল ইসলাম	১০৯
২৯	নিরাপদ খাবার, সবার অধিকার	সালেহ্ আকরাম আকন্দ	১১২
৩০	‘‘নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক”	Abdul Kader Fakir	১১৪
৩১	Preventive Control Measures for Food Adulteration and Allergen	Md. Nazimul Islam	১১৭
৩২	Strengthening National Food Safety System: Addressing the Priorities	Shahriar Ahmed	১২২
৩৩	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ে স্বপ্ন, সক্ষমতা ও সফলতা	মোঃ শাকিব হোসাইন	১২৪
৩৪	Roads to Safe Food	S. M Shipon	১২৭
৩৫	Photo Station		১২৯

"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ: লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ

মো. আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। খাদ্য ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই একটি শিশুর প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, যা তার বেড়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। আর খাদ্য যদি নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি তার মেধা বা মননশীলতারও পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১)-এ সম্পূর্ণরূপে দেশের জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপদতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সাথে খাদ্যের নিরাপদতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা পুষ্টিহীনতায় এবং নানাবিধ খাদ্য ও পানিবাহিত রোগে ভুগছে। এ অবস্থা দূরীকরণে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির কোন বিকল্প নেই। একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপদতা ও সুষম পুষ্টি যা নিশ্চিত হয় নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি থেকে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও খাদ্যের নিরাপদতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর সুখী- সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি। শুধু তাই নয়, রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জন হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচক্ষণতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের পর ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশের পরিণত করার ঘোষণা দেন যার মূল স্তম্ভগুলো হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নেন্স এবং স্মার্ট সোসাইটি। এ কথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উন্নত বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল ভূমিকা পালন করবে সুস্থ এবং কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ। খাদ্যের মান ও নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটররি সংস্থা হিসেবে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য'- এই রূপকল্পকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে একসূত্রে আবদ্ধকরণ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যাত্রা ইতিহাস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেলটা প্ল্যান-২১০০ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ রহিত করে ২০১৩ সালের ১০ই অক্টোবর যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। আইনটি ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকর হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

i. রূপকল্পঃ জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

ii. অভিলক্ষ্যঃ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্য শিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতায় যথাযথ বিজ্ঞানভিত্তিক বিধি-বিধান তৈরি ও কার্যকর প্রয়োগ এবং খাদ্য শৃঙ্খলে পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিনির্মাণ

সীমিত জনবল নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মিতভাবে খাদ্যের নিরাপদতা সংক্রান্ত জনসচেতনতা, গবেষণা এবং খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচারণাসহ ভেজাল ও দূষিত খাদ্য বিক্রয়, আমদানি, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণ বন্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ একটি টেকসই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠনকে কেন্দ্র করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের বার্তাসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে, এমনকি গ্রামাঞ্চলে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের উপজেলাসমূহে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

২। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২৬ বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রত্যেকটি লক্ষ্য পূরণে নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩। দেশে খাদ্যের নিরাপদতার কার্যকর মান নির্ধারণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং নিরাপদতার মানসমূহকে দেশে প্রচলিত মানসমূহের সাথে সমন্বয় করে Standard Harmonization করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত ২৬টি কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪। পারিবারিক ভাবে খাদ্যের নিরাপদতার চর্চা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষ খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টি বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ও পরামর্শে 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে এবং দেশব্যাপী স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এক লক্ষ পরিবারের নিকট এটি বিতরণ করা হচ্ছে এবং পনের হাজার পরিবারকে এই নির্দেশিকার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫। ২০২২ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ খাদ্যপণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে যাচাইয়ের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতার নিশ্চয়তার স্বীকৃতি স্বরূপ হেলথ সার্টিফকেট প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে।

৬। এছাড়া ২০২৩ সালের প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে (৩য় থেকে ৫ম) খাদ্যের নিরাপদতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তকরনের কাজ চলমান রয়েছে।

৭। খাদ্য নিরাপদতার সাথে সংশ্লিষ্ট ০৬ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর রিসার্চ পেপার প্রোপাসাল গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনাসমূহ পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ থেকে রিসার্চ গ্রান্ট প্রদান করা হবে।

৮। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয়, এক্সপোজার এবং জনগণের প্রতি তাদের সেবা প্রদানের বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য Bangladesh Trade Facilitation (BTF) প্রকল্পের সাথে যৌথভাবে গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে দেশে প্রথমবারের মত Food and Chemical Lab Expo আয়োজন করা হয়।

সুদৃঢ় প্রত্যয়ের দীপ্ত অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে গঠিত হলেও মাত্র ছয় বছর বয়সের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- আইন-প্রবিধানমালা প্রণয়নঃ

  নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে ৩টি বিধি ও ১১টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-

  ক) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪

  খ) নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭

  গ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯

  ঘ) খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭

  ঙ) খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭

  চ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭

  ছ) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭

  জ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮

  ঝ) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮

  ঞ) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯

  ট) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০

  ঠ) ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১

  ড) নিম্নমানের, ঝুকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার প্রবিধানমালা, ২০২১

  ঢ) নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১

  এছাড়াও নিম্নোক্ত প্রবিধানমালাগুলো প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে-

  ক) নিরাপদ খাদ্য (বিজ্ঞাপন ও দাবি) প্রবিধানমালা, ২০২১

  খ) নিরাপদ খাদ্য (রেস্তোরাঁ) প্রবিধানমালা, ২০২১

  গ) নিরাপদ খাদ্য (উৎস শনাক্তকরণ) প্রবিধানমালা/ নীতমালা

  ঘ) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্য সহায়ক খাদ্য এবং নিউট্রাসিটিক্যালস ফুড) প্রবিধানমালা

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটিঃ

  নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে।

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিঃ

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার ইতোমধ্যে ০৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা সমন্বয়য় কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ৬৪ জেলায় নিরাপদ খাদ্য অফিসার পদায়নঃ

দেশের সকল জেলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ৬৪ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা পদায়ন করে জেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা, মনিটরিং ব্যবস্থা ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

- জনসচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে সারাদেশে কর্মশালা, সেমিনার, ক্যারাভান রোড শো, পাবলিক মিটিং আয়োজন, পথ নাটক, ভিডিও প্রদর্শন, মাইকিং, লিফলেট, গণবিজ্ঞপ্তি, উঠান বৈঠক, বাল্ক মেসেজ, টিভি স্ক্রল, প্যাম্পলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ, বিভিন্ন স্কুলে হাত ধোয়াসহ বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

i. বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৪টি টিভিসি নির্মাণপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ৫টি টিভিসি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে মোট ৩৮৭ মিনিট প্রচার করা হয় এবং ৫টি গণবিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন সময়ে মোট ৩৬টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ০৭টি টিভিসি মোট ২৮৩ মিনিট প্রচার করা হয় এবং ০৪টি গণবিজ্ঞপ্তি ২৩ টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

ii. ২০২১-২২ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা নিয়ে ৫২ টি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ৫৭টি জনসচেতনতামূলক সেমিনির উপজেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে।

iii. প্রান্তিক পর্যায়ে গৃহিনীদের মধ্যে খাদ্য নিরাপদ রাখার চর্চা বৃদ্ধিতে দেশব্যাপী উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে । ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১২৮টি উঠান বৈঠক আয়োজনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

iv. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতন করতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ১০২ টি স্কুল-কলেজে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

v. ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৪০৬২ জন হোটেল-রেস্তোরাঁর খাদ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

vi. নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টিতে তৈরি করা হয়েছে পথনাটক ও অ্যানিমেশন। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে পথনাটকটি ইতোমধ্যে দেশের ৯টি জনবহুল স্থানে প্রচার করা হয়েছে।

- ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কাজটি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। এরই মধ্যে সব জেলায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান।

i. মনিটরিং কার্যক্রমঃ

ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নিয়মিতভাবে সারাদেশে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিএফএসএ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৫৪৬টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫৪৮টি খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়। বিএফএসএ কর্তৃক ডেজিগনেটেড স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদের দ্বারা ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১,৭২৯ টি খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং করা হয়।

ii. ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাঃ

খাদ্যে ভেজালকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষ্যে সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় যেখানে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৪১ জন, মামলা সংখ্যা ১৪১ টি এবং সর্বমোট অর্থদন্ড করা হয় ১,৯১,০০,০০০ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৯০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় যেখানে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৮৩ জন, এবং সর্বমোট অর্থদন্ড করা হয় ৮৮,০০,০০০ টাকা।

iii. অভিযোগ গ্রহণে হটলাইন চালুকরণঃ

এছাড়াও, খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে অভিযোগ প্রাপ্তি ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কর্তৃপক্ষের নিজস্ব হটলাইন নম্বর ১৬১৫৫ চালু করা হবে।

iv. গ্রেডিং প্রদান কার্যক্রমঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সারা দেশে খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে ৬৫টি হোটেল-রেস্তোরাঁ, মিষ্টি দোকান ও বেকারী কে A+, A, B ও C ক্যাটাগরিতে দক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং এর মাধ্যমে গ্রেডিং এবং ৪০টি খাদ্য স্থাপনাকে রি-গ্রেডিং প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি খাদ্য স্থাপনাকে গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে।

v. Safe Food Plan বাস্তবায়নঃ

মুজিববর্ষের কর্মসূচি হিসেবে ১০০টি খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন সংক্রান্ত Safe Food plan ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নমুনা পরীক্ষণ, মোবাইল ল্যাবরেটরী সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা রক্ষার জন্য সারা দেশ থেকে ঝুঁকিভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের ১০ টি ডেজিগনেটেড ল্যাবের মাধ্যমে তা বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল যাচাইকরণের কাজ করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয় ১২৮২ টি, মানসম্মত নমুনা ছিল ১১৩০টি এবং মানহীন নমুনা ছিল ১৫২ টি। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৫৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়, মানসম্মত নমুনা পাওয়া যায় ৭৫৫ টি এবং মানহীন নমুনা ছিল ৯৯টি। পাউরুটি ও বেকারিতে ক্ষতিকর পটাসিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি যাচাই করার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে পরীক্ষিত ১২২ টি নমুনার মধ্যে ২৭টি নমুনায় ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং উক্ত মানহীন পণ্যসমূহ বাজার থেকে প্রত্যাহার এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা করে গুড়ে বিষাক্ত হাইড্রোজের উপস্থিতি, ভেজাল দুধ ও ভেজাল মধু উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ঢাকা শহরের ৩৫৩টি বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

- কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে “বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্পের মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ে ইলেকট্রিক বোর্ড ও মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান স্থাপন, প্রত্যেক জেলায় বিলবোর্ড স্থাপন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ের জন্য মোটর সাইকেল, কম্পিউটারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্ট প্রকিউরমেন্টের কার্যক্রম গ্রহণ, সারাদেশে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন, খাদ্য ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও JICA এর যৌথ অর্থায়নে “Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority” নামক প্রকল্প -এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ১১টি পাইলটিং জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার এবং খাদ্য পরিদর্শকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্য নমুনার টেস্টিং কীট প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের Referrence Food Testing Laboratory স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী কার্যসমূহঃ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্য নিরাপদতার সচেতনতা বৃদ্ধিতে বানানো হয়েছে 'খাদ্য কথন' অ্যাপস। 'নজর'অ্যাপস এবং 'টেম্পারেচার ডাটা লগার' এর মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থার পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া চতুর্থ বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী আইডিয়া- "কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ভিত্তিক Real-Time ফুড সেফটি মনিটরিং প্রকল্প"- এর মান উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- অন্যান্যঃ

✓ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ ৯ম গ্রেডের ৯৩ জন এবং ১৩-১৬ গ্রেডের ৬৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান এবং বিভিন্ন কারিগরি এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের সব জেলাগুলোতে নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের পদায়ন করা হয়েছে।

✓ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ক মিডিয়া কর্মী ও সাংবাদিকদের নিয়ে সেনসিটাইজেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

✓ ভোজ্য তেলের যথাযথ 'ভিটামিন এ' ফোর্টিফিকেশন এবং ভোজ্য তেল নিরাপদ উপায়ে বাজারে বিক্রয় নিশ্চিতে GAIN এর সহায়তায় মতবিনিময় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

✓ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ব্যবহারকৃত ভোজ্য তেলের বা পুড়া তেলের পুনঃব্যবহার রোধে ব্যবহারকৃত ভোজ্য তেলকে বায়োডিজেল হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে a2i এর সহায়তায় বায়োটেক কোম্পানিকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করেছে। তাছাড়া অস্ট্রিয়া ভিত্তিক কোম্পানি MUENZER এর সাথে এই ব্যবহারকৃত ভোজ্য তেল রপ্তানি বিষয়ক দেশের বিভিন্ন জেলায় সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

✓ খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতনতা জোরদার করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মত 'খাদ্যবার্তা' নামক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে।

✓ কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য JICA এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নিউজিল্যান্ডের MPI এর সাথে Food Safety Cooperation বিষয়ে কর্তৃপক্ষের একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়। সর্বমোট ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU স্বাক্ষর হয়; যার মধ্যে ৬টি সরকারি সংস্থা, ৩টি বৈদেশিক সংস্থা বিদ্যমান।

✓ হলুদে মাত্রাতিরিক্ত লেড (সীসা), কার্বোনেটেড বেভারেজে উচ্চ মাত্রায় ক্যাফেইন, পোল্ট্রি খাদ্যে ট্যানারি বর্জ্য এবং প্রাণী খাদ্যে এমবিএম ব্যবহার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

✓ খাদ্য নিরাপদতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে মোট ১২টি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

✓ পবিত্র রমজান ও কোরবানি উপলক্ষে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টিভি, বেতার, ফেইসবুক ও মোবাইল বার্তার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া মাইকিং, সমন্বিত মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিও প্রদান করা হয়েছে।

✓ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে ৭১টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে।

✓ জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে হটলাইন সেবা ৩৩৩ এর মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিজস্ব হটলাইন ১৬১৫৫ খুব শীঘ্র চালু করা হবে।

✓ ৫০টি খাদ্য পরীক্ষাগারের তথ্য সম্বলিত একটি ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন করা হয়েছে।

✓ FAO এবং আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় - এর সহযোগিতায় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে B.Sc (Hons) Course in Food Safety Management চালু করা হয়েছে।

✓ খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতে দেশবাসীকে সচেতন করার নিমিত্তে সাপ্তাহিক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

- ✓ তাছাড়া IFC, FAO, UNIDO, USAID, USDA এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে খাদ্য নিরাপদতা শীর্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা, আইডিয়া শেয়ারিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে।
- ✓ খাদ্য নিরাপদতার নির্দিষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট ৮টি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখানে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং এক্সপার্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জসমূহ

- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি বিশাল এবং সুশৃঙ্খল কাঠামো, যদি কোনো কারণে এই কাঠামোর একটি ছোট অংশও আপস করা হয়, তাহলে পুরো কাঠামো ভেঙে পড়বে। সীমিত জনবল নিয়ে এত বড় কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এজন্য দরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয় ও সহযোগিতা।
- আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজে খাদ্য নিরাপদতা সংস্কৃতির অনুপস্থিতি।
- হোটেল-রেস্তোরাঁ পর্যবেক্ষণ শেষে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করে না।
- GHP, GMP, GAP বাস্তবায়নে সঠিক জ্ঞানের অভাব।
- নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব
- ঝুঁকি ভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার সমন্বিত সহযোগিতার অভাব।
- নিরাপদ খাদ্য সর্বস্তরে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে অভাবের কারণে অপুষ্টির উচ্চ হার এখনও একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা রয়ে গেছে।
- অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধার এবং তাৎক্ষণিক পরীক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় কীট এবং যন্ত্রপাতির অভাব ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রয়োগের লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানের ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- নিরাপদ ফল পাকানোর জন্য পাইলটিং হিসেবে Artificial Ripening Chamber তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশেষায়িত জনবলকে কর্মক্ষেত্রে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে দেশে এবং বিদেশে বিশেষ কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
- বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টি এবং বাণিজ্য সুবিধার জন্য BFSA এর ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
- খাদ্য নিরাপদতা এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সকল স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।
- বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের standard harmonization এর মাধ্যমে একটি টেকসই ও কার্যকর standard নিরূপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং খাদ্য নিরাপদতার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি, একাডেমিশিয়ান, রিসার্চার এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন এক্সপার্টদের সমন্বয়ে ২৬টি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অনিরাপদ খাদ্যের কুফল

অনিরাপদ ও ভেজাল জাতীয় খাদ্য গ্রহণ একজন ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করে। দূষিত খাবার গ্রহণে জীবাণু ঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক রোগ যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস সংঘটিত হয়। তাছাড়া ট্রান্স ফ্যাট যুক্ত ভাজা-পোড়া খাবার গ্রহণে বিভিন্ন কার্ডিওভাস্কুলার রোগ যেমন- হার্ট অ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোক, উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা দেখা দেয়। ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণে অসুস্থ মানুষের জীবন থেকে যেমন অনেক মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হয়, তেমনি চিকিৎসাজনিত কারণেও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, প্রতি বছর প্রায় ৬০ কোটি মানুষ দূষিত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়। এ কারণে প্রতি বছর মারা যায় ৪ লাখ ৪২ হাজার মানুষ। এ ছাড়া ৫ বছরের চেয়ে কম বয়সী শিশুদের ৪৩ শতাংশই খাবারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়, এর মধ্যে প্রতি বছর প্রাণ হারায় ১ লাখ ২৫ হাজার শিশু। জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই স্যালমোনেলা জীবাণু বহনকারী আইসক্রিম খাওয়ার ফলে ২ লাখ ২৪ হাজার মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯৮৮ সালে দূষিত শামুক ও গলদা চিংড়ি খেয়ে চীনে প্রায় ৩ লাখ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। ২০০৮ সালে চীনে তৈরি কয়েকটি কোম্পানির গুঁড়ো দুধ পান করে বহু শিশু রোগাক্রান্ত হয়। ওই দুধে মেলামাইনের মাত্রা বেশি ছিল। সার্বিক দিক থেকে চিন্তা করলে দেশের জনসম্পদ ও উন্নতির অন্তরায় হিসেবে অনিরাপদ খাদ্যকে চিহ্নিত করা যায়।

খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে জনমনে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

আমাদের সাধারণ মানুষের নিকট খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও যথাযথ চর্চার অভাবে অনেক আগে থেকেই জনগণের মধ্যে এ ধারণাসমূহ প্রচলিত রয়েছে।

১। ফরমালিন নিয়ে একটি ধারণা রয়েছে যে, ফল ও শাক-সবজি তে ফরমালিন মিশিয়ে সেটিকে বিষাক্ত করা হয়, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। সত্যিকার অর্থে ফরমালিন শুধুমাত্র আমিষ জাতীয় খাদ্যের সাথে কাজ করে। কিন্তু ফল ও শাকসবজিতে আমিষ এর পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় ফলের উপর যদি ফরমালিন মেশানোও হয়ে থাকে, তা কখনোই ফলের মধ্যে মিশবে না। তাই বাজার থেকে কিনে আনা ফল ও শাকসবজি প্রবাহমান পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে খেয়ে নিলে ফরমালিনের কোনো ভয় থাকে না।

২। আমরা প্রায় সময়ই চা পান করে থাকি। চা থেকে সাধারণত আমরা গ্রহণ করি ক্যাফেইন নামক একটি উপাদান যা আমাদের আবসাদ দূর করে। কিন্তু ১ মিনিটের বেশি কোনো চা পাতা পানিতে গরম করলে তা থেকে ক্যাফেইনের পরিবর্তে ট্যানিন নির্গত হয়, যা আমাদের বৃক্কের ক্যান্সারের জন্য দায়ী। তাই চা পাতা অনেকক্ষণ ধরে পানিতে গরম করে লিকার বেশি করার প্রচেষ্টাও একটি অনিরাপদ প্রক্রিয়া।

৩। অনেক সময় আমরা দেখি ফল ঘরে অনেকদিন রেখে দেবার পরও ফল পচে যাচ্ছে না। অনেকেই মনে করেন ফলে ভেজাল মেশানো আছে। বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলত ফলের বাইরের আবরণে এক ধরনের খাওয়ার যোগ্য মোমের প্রলেপ পাওয়া যায় (এটি প্রাকৃতিকভাবে থাকে, অনেকসময় কৃত্রিম উপায়েও মেশানো হয়), যাতে করে ফলের ভেতরের জলীয় অংশসমূহ বাইরে না বেরিয়ে আসতে পারে কিংবা বাইরের কোন পচনকারী জীবাণু ফলের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে। এ ধরনের মোমকে এডিবল ওয়াক্স বলা হয়, যেটি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।

৪। অনেক সময় নকল চাল, নকল ডিম এ জাতীয় বিষয়সমূহ শোনা যায়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এ সমস্ত জিনিসের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

৫। বাইরে খাবার গ্রহণের বেলায় অনেক সময় লেখা কাগজে খাবার গ্রহণ কিংবা পরিবহন করা হয়। এতে করে কাগজের লেখা কালি পানি কিংবা তেলের মাধ্যমে খাবারে চলে আসে যা আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। খাবার গ্রহণ কিংবা পরিবহনে কালিবিহীন কাগজ ব্যবহার করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য ও SDG

খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ আলোচ্যসূচির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সকল লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে। এটি ৩ নং লক্ষ্যমাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ (সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধ জীবন)। লক্ষ্যমাত্রা ১ (দারিদ্র বিমোচন), লক্ষ্যমাত্রা ২ (ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব) এবং লক্ষ্যমাত্রা ৬ (নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন) অর্জনে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ৫ (লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন), লক্ষ্যমাত্রা ৮ (উৎপাদন মুখী কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), লক্ষ্যমাত্রা ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও

অবকাঠামগত উন্নয়ন), লক্ষ্যমাত্রা ১০ (বৈষম্য হ্রাস), লক্ষ্যমাত্রা ১১ (টেকসই নগর ও জনপদ), লক্ষ্যমাত্রা ১২ (সম্পদের উৎপাদন ও টেকসই ব্যবহার), লক্ষ্যমাত্রা ১৪ (জলজ জীবন), লক্ষ্যমাত্রা ১৫ (স্থলজ জীবন) -এর অভীষ্ট অর্জনে নিরাপদ খাদ্য অবদান রাখে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব

গত ২৪ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এ সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য যেমন গৌরবের, অনেক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে তেমনি তা আমাদের জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এসে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। সামনের দিন গুলোতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে WTO-SPS এর নিয়মানুসারে খাদ্য নিরাপদতার মানও বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে GAP, GMP, GHP, GAqP প্রভৃতি বিষয়েও যথাযথ গাইডলাইন প্রয়োজন যেখানে খাদ্য নিরাপদতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। তাছাড়া সুস্থ ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে নিরাপদ খাদ্য এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার কর্তৃক গৃহীত ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১, ডেলটা প্ল্যান –এর সঠিক বাস্তবায়নে নিরাপদ খাদ্যের রয়েছে কার্যকর ভূমিকা। তাছাড়া আমাদের ট্যুরিজম সেক্টরের উন্নয়নেও নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অনেক।

উপসংহার

আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সারাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন হতে খাবার টেবিল পর্যন্ত খাদ্যকে জনগণের জন্য নিরাপদ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে সমস্যাবলী ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। দেশে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৩৫ তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। যুক্তরাজ্যের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২১ অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন যে ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে। সরকারে পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে একটি দক্ষ, কর্মক্ষম এবং সুস্থ জাতি বিনির্মাণের মাধ্যমে উন্নত দেশ হিসেবে তথা স্মার্ট বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে এবং সাথে সাথে দেশের সকল মানুষের পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে- এ প্রত্যাশা হোক আমাদের সকলের।

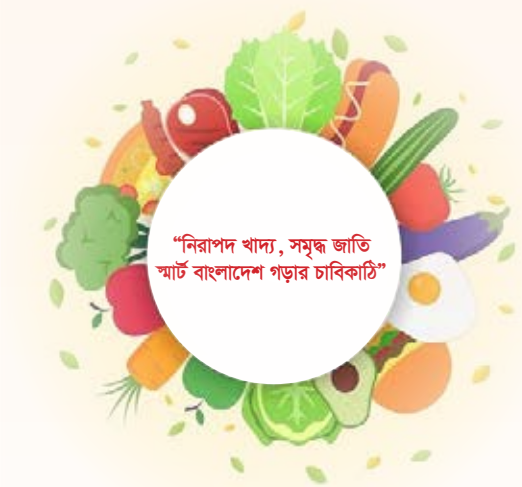

গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্ময়কর রুপান্তর ও খাদ্য নিরাপত্তা

ড. আতিউর রহমান
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

গত এক দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। অনেক সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি ও সেগুলোর বেশির ভাগের সুদক্ষ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো গ্রাম এখন নগরের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। একই সঙ্গে মানুষের নিজেদের উদ্যোগ, সামাজিক পুঁজির প্রয়োগ এবং অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয়তার সুফল বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি পাচ্ছে। ব্যক্তি খাতও কিন্তু পিছিয়ে নেই। গ্রামেও এখন সেবা খাতের তৎপরতা প্রায় সমান দৃশ্যমান। চায়ের দোকান, কফি শপ, রেস্তোঁরা, সেলুন, বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, কোচিং সেন্টার, হেলথ ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, সাইবার ক্যাফের উপস্থিতি এখন গ্রামাঞ্চলেও খুব স্বাভাবিক। কৃষি ও অকৃষি খাত হাত ধরাধরি করে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজে এই বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ কমেছে ঠিকই। কিন্তু সেবা খাতের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তা সামাল দেয়া গেছে ভালোভাবেই। পরিসংখ্যান বলছে এখন গ্রামীণ আয়ের ষাট শতাংশ আসে অ-কৃষি খাত থেকে। নানামাত্রিক উদ্যোক্তারা এই অ-কৃষি খাতের সাথে যুক্ত। তরুণ শিক্ষিত উদ্যোক্তারা বিশেষ করে ডিজিটাল উদ্যোক্তারা এই খাতে এখন বেশি বেশি যুক্ত হচ্ছেন। তারা গ্রামে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষি খামার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে চলেছেন। অ-কৃষি খাতের এই উন্নতির পেছনে কৃষি খাতের ভূমিকাও কম নয়। উপকরণ সরবরাহ ও চাহিদার যোগান দিয়ে কৃষি অ-কৃষি খাতকে চাঙ্গা রাখছে। বস্তুত আমরা দুপায়েই হাঁটছি। আর পরিবর্তিত এই সব সূচকই বলে দিচ্ছে আসলেই বাংলাদেশের দিন বদলেছে। চারিদিকেই যে পরিবর্তনের উতল হাওয়া বইছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির এই পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য তার বাড়তি উৎপাদনই যথেষ্ট নয়। উৎপাদিত সেই খাদ্যের বিলি বন্টনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য মানুষের হাতে খাদ্য কেনার সক্ষমতার প্রয়োজন। আর তা সম্ভব তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে। এমনটি করা গেলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না। তাই চলমান বিশ্বমন্দার এই সংকট কালে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কোনো আশঙ্কা তৈরি হয়নি।

আমরা জানি যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জীবন মানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে কৃষির আধুনিকায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অ-কৃষি খাতের বিস্তার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার, এবং সর্বোপরি প্রাবসী আয় বৃদ্ধি। তবে এ সবগুলো শক্তিকে এক সূত্রে গাঁথতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সরকারের যথাযথ সহায়তায় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান। এক যুগ আগে বঙ্গবন্ধুকন্যার দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গিকার নিয়ে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান শুরু করেছিলাম তার পেছনে মূল ভাবনাটিই ছিলো সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণের কাছে সহজে উপযোগি আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া। উন্নয়নমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের দর্শনের জায়গা থেকেই আমরা সর্বাত্মক কাজ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা ছিলো ০১) কৃষি অর্থায়নে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবাদাতাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার, ০২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশে সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন তদারকি করা, ০৩) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে কৃষি ও অ-কৃষি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক সেবা নিশ্চিত করা, এবং ০৪) প্রবৃদ্ধি যেন সবুজ তথা পরিবেশবান্ধব হয় সে দিকে বিশেষ নজর রাখা। আর এ সব লক্ষ্য অর্জনে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সঙ্গত কারণেই বেছে নেয়া হয়েছিলো সর্বাধুনিক ডিজিটাল আর্থিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগকে। এর সুফলও আমরা দেখেছি। মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের আর্থিক খাতে ঘটে গেছে এক নীরব বিপ্লব। আর এ কারণেই গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও অ-কৃষি খাতের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ যেমন নিশ্চিত করা গেছে, তেমনি প্রবাসী আয় সহজে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছানোর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমেই চাঙ্গা হয়েছে। শুনে অবাকই লাগে ২০২০ সালে করোনাকালে জুলাই-সেপ্টেম্বর এই

তিন মাসে এজেন্ট ব্যাংকের এজেন্টরা ৩০,৩৩৫ কোটি টাকার রেমিট্যান্স উপকরভোগীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আগের বছরের ঐ সময় থেকে তা ২২১ শতাংশ বেশি। এর পাশাপাশি মোবাইল আর্থিক সেবা তো আছেই। আর হালে এই ধারা আরও বেগবান হয়েছে।

সাম্প্রতিক দশকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারিত হওয়ায় এ দেশে গ্রামীণ বাস্তবতায় নাটকীয় সব পরিবর্তন এসেছে- এ কথা সত্য। তবে স্বাধীনতার পরপরই কিন্তু উদ্ভাবনী আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিগুলোর কারণে গ্রাম-বাংলার ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিলো। শুরুটা হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর নেয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হাত ধরেই। ঐ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ২৪ শতাংশই রাখা হয়েছিল কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য। আধুনিক সেচ, বীজ, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর জোর দিয়ে বঙ্গবন্ধু গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে আরো অনেক প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের অভিযাত্রা লক্ষ করি। পুরোটাই ছিল দেশজ। সৃজনশীলতা। এমএফআইগুলোর বিকাশও সম্ভব হয়েছিল সরকারের নীতি উদারতার কারণে। সত্তর ও আশির দশকে সারা দেশেই বিস্তৃত হয়েছিলো এমএফআইগুলো। সরকারের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এদের কারণেই যে দরিদ্র মানুষেরা আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার বাইরে ছিলেন তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়েছিলো, বেড়ে উঠেছিলো গ্রামীণ অ-কৃষি খাত এবং ক্ষুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তারা- সে কথা মানতেই হবে। ব্যক্তিখাতও বসে ছিল না। গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরে ব্যক্তিখাতের অবদানও ছিল উল্লেখ করার মতো। তবে নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা এ খাতের বিকাশকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ দেশের মাইক্রোফাইনান্স খাত প্রধানত দাতাদের সহায়তা নির্ভর হলেও এখন এ খাত অনেকটাই স্বাবলম্বী। সত্যি বলতে মাইক্রোফাইনান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিলের ৮৪ শতাংশই এখন আসছে নিজস্ব উৎস থেকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সঙ্গে মাইক্রোফাইনান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগসূত্র গড়ে তোলায় এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও মাইক্রোফাইনান্স তহবিলের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। গত এক দশকে মাথাপিছু মাইক্রোফাইনান্স প্রদানের পরিমাণ বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাথাপিছু মাইক্রোফাইনান্স দেয়া হয়েছিলো প্রায় ১৪ হাজার টাকা। আর এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার টাকায়। ঋণ প্রদানের পরিমাণ বাড়লেও কিস্তির টাকা ফেরত পাওয়ার হার (রিকভারি রেট) ধারাবাহিকভাবে ৯০ শতাংশের ওপরেই ধরে রাখা গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে সময়ের সাথে সাথে মাইক্রোফাইনান্স খাত আরও পরিণত হয়ে উঠছে। ফলে মাইক্রোফাইনান্স প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়ে তাদের সেবার ব্যাপ্তি আরও বাড়াচ্ছে। যেমন: মাইক্রো-ইনস্যুরেন্স নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠানই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। একই রকম উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকেও নেয়া হচ্ছে। কখনও কখনও ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের সুদের হার বেশি হয় বলে সরকার সুদে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। তবে গ্রামীণ অর্থায়নকে আরও বাজার-নির্ভর ও সামাজিক দায়বদ্ধ করার যথেষ্ট সুযোগ এখনও রয়ে গেছে। এখন গ্রামীণ উদ্যোগগুলোর জন্য পুজিঁর চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। সেজন্য এমএফআইগুলোকে বাজার থেকে আরও বেশি সঞ্চয় সংগ্রহের নীতি সমর্থন দেয়া যেতেই পারে। আর ব্যাংক ও এমএফআইগুলোর চলমান সংযোগ কর্মসূচি সঙ্কোচন না করে তা কি করে আরও প্রসারিত করা যায় সেদিকে নীতি নজর বাড়ানোর প্রয়োজন।

তবে গ্রামাঞ্চলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কিন্তু শুধু মাইক্রোফাইনান্সেই আটকে নেই। বরং মূল ধারার ব্যাংকিং সেবাও বিশেষ করে গত এক দশকে পৌঁছে দেয়া গেছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারি প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায়। এই ধারাকে আরও বেগবান করতে ডিজিটাল অর্থায়নের নয়া সুযোগকে কাজে লাগানোর নয়া সম্ভাবনাও হালে তৈরি হয়েছে। ইন্টারঅপারেবল লেনদেন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে তার সুযোগ নিয়ে নিশ্চয় বাংলাদেশে নগদ অর্থে লেনদেনের পরিধি কমিয়ে ফেলা সম্ভব। সেজন্য প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে 'ফিনটেক' বা প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক সেবার আরও উদ্ভাবন অপরিহার্য। সুখের কথা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেগুলেটরি সহায়তায় ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তারা এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের ব্যাংকের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক দশকে পরিচালিত ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারি এবং সচরাচর আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার বাইরে থাকা নাগরিকদের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়াকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকারাও যেন সহজে ব্যাংকিং সেবা পান সে জন্য এ সময়ে প্রায় দুই কোটি ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে, কৃষি ঋণের সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে ১৩০ শতাংশ, বর্গাচাষিদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রকল্পের আওতায় ১৬ লক্ষ কৃষিজীবিকে ঋণ দেয়া হয়েছে (যাদের মধ্যে বড় অংশটিই নারী)। অ-কৃষি খাতকে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বতন্ত্র এসএমই বিভাগ খোলা হয়েছে, দেয়া হয়েছে সুবিবেচনাভিত্তিক এসএমই অর্থায়নের গাইডলাইন। এসএমই অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর নির্দেশনা ও তদারকির ফলে ২০১০ থেকে ২০১৭ সময়কালে ৪৫ লক্ষ এসএমইকে প্রায় ৯৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রামের ক্ষুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাছে গেছে, ফলে সেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, কমেছে কৃষির ওপর নির্ভরতা। এছাড়াও সিএমএসএমই ঋণের ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় এ সময়ে ৪ লক্ষের বেশি নারী উদ্যোক্তা পেয়েছেন ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ। এ সবের পাশাপাশি জামানতবিহীন হিসাবধারিদের জন্য ২৪ মিলিয়ন ডলারের পুন:অর্থায়ন কর্মসূচি, ১৫ লক্ষ স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মতো উদ্যোগগুলোর

সুফলেরও বড় অংশ গিয়েছে গ্রামাঞ্চলে। যেমন মাত্র চার শতাংশ হারে ভুট্টা ও মসলা চাষীদের ঋণের পুন:অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর সুদূরপ্রসারি প্রভাব গ্রামীণ মৎস্য, মুরগি ও গবাদি পশুর উদ্যোগে ঠিকই পড়েছে।

বাংলাদেশে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারি গ্রাহকদের কাছে সুলভে বিভিন্ন রকম আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধানতম ভূমিকাটি পালন করেছে ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ। এক্ষেত্রে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এবং এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক দশক আগে এমএফএস-এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে 'ব্যাংক লেড মডেল' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তিন চার বছরের মধ্যেই সর্বস্তরের নাগরিকদের এমএফএস সেবার আওতায় নিয়ে এসে সারা বিশ্বের ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সে সময়ের সাহসী ও সুবিবেচনাপ্রসূত উদ্যোগের সুফল পাওয়া গেছে করোনা পরিস্থিতিতে। করোনার মাসগুলোতে প্রতি মাসেই এমএফএস লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। কারণ আংশিক-লকডাউনের সময় প্রায় সর্বস্তরের মানুষই নির্ভর করেছেন মোবাইলভিত্তিক আর্থিক লেনদেনের ওপর। জুলাই ২০২০ এর হিসাব মতে ওই এক মাসে এমএফএস লেনদেনের পরিমাণ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৮ শতাংশ বেশি। মানুষ বেশি মাত্রায় এমএফএস-এর ওপর নির্ভর করার ফল স্বরূপ এই সেবার ওপর তাদের আস্থাও বেড়েছে। ফলে বেড়েছে এমএফএস হিসাবের সংখ্যাও। নতুন সেবাও আসছে। সিটি ব্যাংক ও বিকাশ এমএফএস-এর মাধ্যমে ন্যানো ঋণ বিতরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই এই ক্ষুদে ঋণের অনুমোদন কয়েক মিনিটেই করা সম্ভব হচ্ছে। এই ধারার ডিজিটাল অর্থায়নের ধারা আরও বেগবান নিশ্চয় বাংলাদেশ ব্যাংক করতে পারে। খুব শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংক কয়েকটি ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমতি দেবে বলে শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইন্টার-অপারেবল লেনদেন ব্যবস্থা 'বিনিময়' এরই মধ্যে চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাক ও সরকারের আইসিটি বিভাগ। এই 'বিনিময়' ডিজিটাল অর্থায়নে বিপ্লব ঘটাতে পারে। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির চলমান রূপান্তর এই আধুনিক লেনদেন ব্যবস্থার সুফলও পাবে।

এজেন্ট ব্যাংকিংও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ আর্থিক সেবার নয়া দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ২০১৮-এ উন্নয়ন সমন্বয় পরিচালিত মাঠ জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৫২ শতাংশ এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রাহক জানিয়েছেন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তাদের বসবাসের স্থানের খুব কাছাকাছি হওয়ায় তারা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সময় বাঁচাতে পারছেন। আবার ৬৭ শতাংশ গ্রাহক জানিয়েছেন এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা আসার আগে ব্যাংকে যেতে যাতায়াত বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হলেও এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট কাছাকাছি হওয়ায় তাদের আর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। কেবল সময় ও অর্থ সাশ্রয়ই নয়, এজেন্ট ব্যাংকিং সঞ্চয়ের প্রবণতাও বাড়াচ্ছে। যেমন: উল্লিখিত জরিপে ২০ শতাংশ গ্রাহক জানিয়েছেন তাদের এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু হওয়ায় তাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছে, অন্যথায় হতো না। এ সব সুবিধার কথা বিবেচনা করেই গ্রাহকরা এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন। সঞ্চয়ের জন্য গ্রাহকরা বেশি যাচ্ছেন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলোতে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক রূপান্তরের জন্য উন্নয়নমুখী ব্যাংকিংয়ের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অনুসরণীয়। তবে একই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের শিখে শিখে আরও উন্নতি করতে হবে। গত ১০-১২ বছরের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান থেকে দেখতে হবে কোন উদ্যোগগুলো সবচেয়ে সফল হয়েছে এবং ঐ সাফল্যের পেছনের কারণগুলোকে ভালোভাবে অনুধাবন করে তার ভিত্তিতে আগামীর পথনকশা দাঁড় করাতে হবে। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামনেও রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। প্রবৃদ্ধির ধারা অটুট রেখে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, বাড়ন্ত আয় বৈষম্য, খেলাপী ঋণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই আমাদের এগুতে হবে। ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা মাইক্রো-অর্থনীতির প্রসারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের অগ্রযাত্রা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিকাশ ও স্থিতিশীলতার ওপর ভর করে আগামী দিনে আরও গতিময় হবে সেই প্রত্যাশাই করছি। আর সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রেখেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও প্রযুক্তি ও উদ্যম যুক্ত করা গেলে পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্র একই সঙ্গে আরও মজবুত ও প্রসারিত হবে। এই খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে হলে আমাদের কৃষিখাতকে আরও বেশি পরিবেশসম্মত এবং জনস্বাস্থ্য- সহায়ক করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। পশ্চিমের ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে যে পরিমাণ সচেতনতা বেড়েছে আমাদের মতো দেশে তা একইভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। সেজন্যে দরকার খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিতরণের পুরো প্রক্রিয়ায় পরিবেশসম্মত অবকাঠামো গড়ে তোলা। শুধু নীতি পরিবর্তন নয়, বাস্তবেও ভোক্তাদের আচরণগত পরিবর্তন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্যে দরকার অংশিজনদের মাঝে উপযুক্ত নেটওয়ার্কিং এবং স্মার্ট সংযোগ। আশা করি আগামীর বাংলাদেশ সেই পথেই হাঁটবে।

NUCLEAR AND ISOTOPIC TECHNIQUES IN ACHIEVING FOOD SAFETY IN BANGLADESH

Dr. Mirza Mofazzal Islam — Director General
Dr. Md. Rafiqul Islam — Principal Scientific Officer
Md. Nazmul Hasan Mehedi — Scientific Officer
Abu Sayeed, Md. Hasibuzzaman — Scientific Officer

Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
Mymensingh

Sufficient supplies of healthy food are essential for maintaining life and fostering wellness.Foodsbecome unsafe during handling, preparing and storing and create the risk of individuals becoming sick from foodborne illnesses. It is an essential aspect of food production and handling as it ensures that the health and safety of consumers are protected from any food-related issues.Infectious or toxic microorganisms, parasites, or chemicals can contaminate food and make their way into a person's digestive tract, resulting in foodborne sickness. Pollution from hazardous chemicals can cause both immediate poisoning and chronic conditions like cancer. Numerous food-related illnesses can cause serious, perhaps fatal, complications. Due to underreporting and the difficulty in establishing causal linkages between food contamination and the resultant illness or death, the burden of foodborne diseases on public health and economies has often been underestimated.Each year, food poisoning causes the premature death of 0.42 million people and the premature loss of 33 million healthy years of life worldwide.

Bangladesh is among the most vulnerable countries in the world that are exposed to unsafe food hazards.The supply of nutrition and safe food are a significantchallenge for any country, especially in developing countries. If food is tainted with bacteria, viruses, or parasites, or if it contains chemicals or poisons, it will become unsafe. In Bangladesh,perishable products, i.e. fruits and vegetables contain 70-80% water, so they rot quickly due to insects, diseases or environmental factors and lose their quality, ultimately becoming unsafe to eat. Due to bacterial infections, temperature, humidity, various chemical reactions, insect infestation, improper processing, preservation and marketing, about 20-40% of fruits and vegetables are lost. While encountering adverse environmental conditions, bacterial and insect infestation, preservation defects, etc., perishable food grains are spoiled within a few days of collection from the field and waste 26.2%. We are facing substantial losses financially as well as deficits in meeting our nutritional needs.Analysis of agricultural data shows that the annual losses of onion, potato, rice, pulses and mangoes are 20-25%, 5-8%, 8-9%, 5-6% and 30-35%, respectively, which in terms of money about Tk 19,750 crores. These massive losses of agricultural products can be saved by 80-90% through nuclear (irradiation) and stable isotopic techniques.

Nuclear techniques can help detect, monitor and track contaminants in foods.The primary technique to detect food fraud is measuring and analyzing naturally occurring stable isotopes. Isotopes are measured by isotope ratio mass spectrometry (IRMS), and the ratios of isotopes can be compared to authentic foods to distinguish between true and adulterated foods.In Bangladesh, where honey production has increased for domestic consumption and export, the Joint FAO/IAEA Centre of Nuclear Techniques provided nuclear technical training and support to trace food fraud and adulteration. In 2021, by using IRMS, 12 samples were found to be adulterated with sugar syrup. Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) possesses an IRMS and can detect food adulteration by stable isotopic technique. Several stable isotopes to detect food fraud are available (Table 1) and can be used in Bangladesh.

Table 1: Isotopic techniques to ensure food safety

Stable Isotope	What can be determined?	What food fraud can be identified?	What products can be affected?
Carbon	Photosynthesis (C_3, C_4, CAM pathways)	Adulteration (e.g. sweetening with cheap sugar)	Honey, Butter, Olive oil
Hydrogen	Local-regional rainfall and geographic area	Watering of beverages; origin of a product	Coffee, Water, Sugar, Meat
Nitrogen	Fertilizer assimilation by plants	Mislabeling (Organic or non-organic)	Vegetables, Meat
Oxygen	Local-regional rainfall and geographic area	Watering of beverages; origin of a product	Coffee, Water, Sugar, Meat
Sulfur	Local soil conditions; the proximity of the shoreline	Origin of a product	Vegetables, Meat, Honey

(Source: Thermo Fisher Scientific)

Modern irradiation technology (Gamma ray, X-ray and e-Beam) plays a significant role in killing pathogens and insects in food, maintaining healthy qualities, and slowing down physiological processes, i.e. delaying germination (e.g. onion, potato) and gaining maturity (e.g. mango, banana). The Codex Alimentarius Commission (CAC) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization (WHO) Joint Food Standard Program adopted the global standard on food radiation in 1983, resulting in confidence in the safety and effectiveness of technology for governments and consumers. As a result, about 38 countries then approved the application of radiation to one or more food items.

The radiation time varies due to the difference in the level of the radiation dose applied to the product. Radiation time is usually determined before application based on the dose rate and source strength of the radiation source. Required dosage levels to be used for agricultural products andfoodstuffs are mentioned below.

- Low dose (<1 kGy):
  Purpose: Sprout inhibition, ripening delay, disinfection, parasitic inactivation, pest control in grains and fruits.
- Medium dose (1-10 kGy):
  Purpose: Reduction of damaged microorganisms, reduction of pathogens *(E. coli; Salmonella).*

Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) has the technical capability to apply radiation technology to ensure food safety. All the activities i.e. planning, operation, calibration, dosimetry, dose mapping, repair and maintenance of the gamma research irradiators etc.,have subject matter specialists at BINA for the peaceful use of atomic energy in the implementation of irradiation and research activities.Intending to reduce food-borne microorganisms and post-harvest losses dramatically, BINA is preparing a proposal to create a food irradiation centre in Gazipur. Ionizing radiation will sterilize the centre's crops, extending their shelf life.

Onions and potatoes can be kept fresh for an additional three months if irradiated. According to BINA's research, this method can extend the shelf life of mangoes by 20–25 days, that of litchis and bananas by seven days, and that of vegetables by up to 25 days. If the shelf life of perishable agri-items can be increased, marketing of the products will suffer a huge change. The technologycan potentially increase agricultural exports, especially for high-value crops, spices and fruits. Since irradiation can reduce or eliminate bacteria and insects, it also improves food safety and prolongs its shelf life. Irradiation, like the pasteurization of milk and the canning of fruits and vegetables, can reduce the risk of foodborne illness.

Creating general awareness of food safety will comprehensively supplement the existing regulatory enforcement mechanism and institutional backbone to prevent food contamination and reduce the burden of foodborne diseases. Access to sufficient amounts of safe and nutritious food is vital to sustaining life and promoting good health. BINA's nuclear technology not only ensure food safety but also accelerate comercialization and exporting of agri-food products. Good collaboration between governments, producers and consumers is needed to help ensure food safety and more robust food systems. BINA can contribute a lot in this regard. Addressing this issue in collaboration with BINA can help to achieve food safety in Bangladesh.

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

খাদ্য হলো মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম মৌলিক চাহিদা। খাদ্য নিরাপত্তা হলো স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান যা ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। মাছের প্রাপ্যতা এবং বাজার মূল্য বর্তমানে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। পুষ্টিগুণ বিচারে মাছ পর্যাপ্ত আমিষ ও প্রচুর অনুপুষ্টিতে ভরপুর যা সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহ গঠনে এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। অপরদিকে সামুদ্রিক মাছে রয়েছে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুপুষ্টি আয়োডিন। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছ হতে প্রাপ্ত ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। আমাদের দৈনিক মাথাপিছু ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম।

নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার ফলে দেশে বর্তমানে (২০২০-২১) মাছের উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত দশ বছরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২য় । এছাড়াও স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৩য়। ইতোমধ্যে আমরা মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। তবে নিরাপদ মাছ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন, বিক্রয় এবং রপ্তানী ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।

জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাননিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৭৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিক কালে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে বিগত দশ বছরে বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, মাছের রোগ নিরাময়ে ভ্যাকসিন তৈরি, একোয়াপনিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ ও সবজি উৎপাদন, কুঁচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, নোনা পানির চিত্রা ও দাতিনা মাছের পোনা উৎপাদন, সাগর উপকূলে সীউইড চাষ ও এর ব্যবহার, বিএফআরআই মেকানিকাল ফিশ ড্রায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন শুটকিমাছ উৎপাদন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং মিঠাপানির মাছের জাত উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি নিরাপদ ও গুণগত মান-সম্পন্ন মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিতে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করছে সরকার। ক্লাস্টার পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদের ফলে হেক্টর প্রতি গড়ে ১২০০-১৫০০ কেজি উৎপাদন পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় এ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত চিংড়ি জৈবিক ও রাসায়নিক দূষণমুক্ত হওয়ায় শতভাগ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। চিংড়ি চাষ এলাকায় মাত্র ২০% ক্লাস্টার পদ্ধতিতে এবং ১০% আধা-নিবিড় প্রযুক্তির চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হলে বর্তমান উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, চিংড়ি রপ্তানির আর্ন্তজাতিক বাজারে টিকে থাকতে বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice) এবং প্রক্রিয়াকরণের সকল স্তরে Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ৫০টির অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করছে যার প্রায় ৭০% ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস। মানসম্মত মৎস্যপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে পরীক্ষার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় আর্ন্তজাতিক মানের ৩টি মান

নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সংকট, অবকাঠামোর অভাব, কোয়ারেন্টাইন সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের ১৭টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে ফিসারিজ কোয়ারেন্টাইনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। বহি:বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির মাধ্যমে সংক্রামক রোগ, জুনোটিক রোগসহ মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ট্রান্সবাউন্ডারি ডিজিজ থেকে রক্ষার জন্য মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮ প্রণয়ণ করা হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। পুকুরে চাষের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় যেমন নদ-নদী, প্লাবনভূমি, সুন্দরবন, হাওড়-বাওড়, কাপ্তাই লেক ইত্যাদি জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের বর্তমান উৎপাদন তুলনামূলক কম (১৩, ০১, ২৪৪ মে. টন)। ২০২০-২১ সালের তথ্যানুযায়ী নদী ও মোহনায় হেক্টরপ্রতি মাছের উৎপাদন ৩৯৫ কেজি, সুন্দরবনে ১২১ কেজি, বিলে ৯১৯ কেজি, কাপ্তাই লেকে ১৭৯ কেজি, প্লাবনভূমিতে ৩১২ কেজি এবং বাঁওড়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৪০৮ কেজি। অথচ পুকুরে মাছের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৫১২৯ কেজি। ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদনে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬৩ শতাংশ হলেও ২০২০-২১ অর্থ বছরে তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.১৬ শতাংশ। অপরদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ৩.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে একই সময়ে ৫৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তাই দেশে ৩৮.৬০ লক্ষ হেক্টরের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। এতে দেশে অনায়াসে আরো ৮-১০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। আমাদের মাছের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৪.৭৪ ভাগ (৬.৮১ লক্ষ মে.টন) সামুদ্রিক মাছের অবদান। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি থেকে এ উৎপাদন খুবই কম। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকার ফলে আমরা কাঙ্খিত উৎপাদন পাচ্ছি না। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ ও বিস্তৃতি নির্ণয় এবং সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমুদ্রে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত জরিপ থেকে আহরিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মৎস্য চাষীদের বিজ্ঞানভিত্তিক ও নিরাপদ মাছ চাষ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ও মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ব্যতিত ঔষধ হিসেবে কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোনের ব্যবহার নিরাপদ মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। মাছ উৎপাদনের উৎস হতে ভোক্তার নিকট পৌছা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে অননুমোদিত চর্চা অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ মৎস্য প্রাপ্যতায় বিপত্তি ঘটায়। দেশের বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বেড়েছে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ। ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও, অনেকক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান এবং উৎস প্রশ্নের সম্মুখীন। রাসায়নিক ও এনজাইমজনিত কারণে বাইরের আর্দ্রতা, আলো, তাপ, জীবাণু, অক্সিজেন ইত্যাদির প্রভাবে পচনে সহায়তাকারী ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, মোল্ড ও ভাইরাসের মত অনুজীবের সংক্রমণে মাছ খুব সহজেই খাবারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে সঠিক পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণের অভাবে এখনো দেশে আহরণকৃত মাছের শতকরা ১২-১৯ ভাগ পঁচা অবস্থায় ভোক্তার হাতে পৌছে। পঁচা মাছ রান্না করে খাওয়ার ফলে ভোক্তাগণ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ পুষ্টি কম পেয়ে থাকেন। তাছাড়া, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ব্যস্ততা বাড়ায় সরাসরি কিংবা স্বল্প পরিশ্রমে খাবার উপযোগী মানসম্মত পণ্য এখন সময়ের চাহিদা।

মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সরবরাহ তথা মৎস্যপণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত খাদ্য নিরাপত্তা (food safety) নিশ্চিত করা বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মাছের উৎপাদন হতে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যন্ত সকল ধাপে কার্যকর মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি আরোপের মাধ্যমে পণ্যের খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণগতমান নিশ্চিত করে ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে অনেক সফলতা অর্জন করেছে। দেশে ৩টি আর্ন্তজাতিক মানের কোয়ালিটি কনট্রোল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব বাজারে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে মাছসহ সকল জলজ প্রাণিতে অ্যান্টিবায়োটিকের দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির প্রয়োগ এবং পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে। অপরদিকে, মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত সকল পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর চেতনায় টেকসই উন্নয়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি

ড. অনিমা রানী নাথ
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতেই বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছে। সুস্থ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে পরিমিত পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যগ্রহণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর নেতৃত্বে রচিত ১৯৭২ এর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয় "জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে"।

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে এক গুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসডিজির ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সকল দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশের জন্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রযোজ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টিকারী একটি দেশ।

এসডিজির যে সকল লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেগুলোর সাথে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মিল পাওয়া যায়। যেমন, এসডিজি-তে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ক্ষুধামুক্তির কথা। জাতির জনক দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই তিনি বলেছিলেন, "এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের যুবকেরা চাকরি না পায়"। পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম মৌলিক অধিকার নিরাপদ খাবার।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫/১ ধারায় প্রতিটি মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিতের কথা উল্লেখ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) ও ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যক। মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। মূলত: খাদ্যের ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাই সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। জাতির জনক এ বিষয়টি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন পুষ্টিহীন জাতি মেধাশূন্য, আর মেধাশূন্য জাতি যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য বাধা। তাই ১৯৭৩ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নে Bangladesh National Nutritional Council (BNCC) গঠন করেছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সবুজ বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সকল নাগরিকের সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন-যাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এরই ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহের সাথে মিল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান, ক্ষুধানিবৃত্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান এবং খাদ্য নিরাপদতা রক্ষার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ রহিত করে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন,২০১৩ প্রণীত হয়।

আইনটি ২০১৫ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকর হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এ কর্তৃপক্ষ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে থাকে।

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপদতা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ আলোচ্য সূচির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সকল লক্ষ্য অর্জনে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপদতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে রয়েছে ১৭টি অভীষ্ট। অভীষ্টগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো:

লক্ষ্যমাত্রা ১। ২.১. ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো। লক্ষ্যমাত্রা ২ (ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব), লক্ষমাত্রা-৩ (সু-স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধ জীবন), লক্ষ্যমাত্রা ৫ (লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন), লক্ষ্যমাত্রা ৬ (নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন) লক্ষ্যমাত্রা ৮ (উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), লক্ষ্যমাত্রা ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন), লক্ষ্যমাত্রা ১০ (বৈষম্য হ্রাস), লক্ষ্যমাত্রা ১১ (টেকসই নগর ও জনপদ), লক্ষ্যমাত্রা ১২ (সম্পদের উৎপাদন ও টেকসই ব্যবহার), লক্ষ্যমাত্রা ১৪ (জলজ জীবন), লক্ষ্যমাত্রা ১৫ (স্থলজ জীবন) এর অভীষ্ট অর্জনে নিরাপদ খাদ্য অবদান রাখে।

বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি টেকসই জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প নেই। জাতিসংঘের Sustainable Development Solution Network Report -২০২১ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন রির্পোটে বলেছে, এইচটিসি সূচকে বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। ২০১৭ সালের সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২০তম। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর ৬৩.৫ যা বাংলাদেশের জন্য আশাব্যঞ্জক। এসডিজিকে সমন্বিত করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে যা উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সমাজের দারিদ্র্য, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একীভূত করেছে। এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি-কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

দেশের সার্বিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নেতৃত্বে জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসংখ্য টেকসই প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ফসলের জাত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে চলেছে। ফসলের অধিকতর উৎপাদনের লক্ষ্যে এবং পুষ্টি নিরাপত্তা বিবেচনায় অঞ্চলভিত্তিক ফসল বিন্যাস এবং সে অনুযায়ী চাষাবাদ হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য উৎপাদন চাহিদার বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'ক্রপ জোনিং' ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের বিষয়টি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ পুষ্টি পরিষদ গঠনের আদেশে স্বাক্ষর করেন। খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশের সামগ্রিক যে অগ্রগতি হয়েছে তা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ভিশন-২০৪১ এর অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক হবে। পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত বিজ্ঞানীগণ তাঁদের ধারাবাহিক এবং নিরন্তর গবেষণার ফলে সিমসহ বিভিন্ন ফলদ শাকসবজির জাত উদ্ভাবন করেছে। ফলে সারাবছর শাকসবজি ও ফল-ফলাদির চাষ হচ্ছে যা দেশের সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় এসডিজি-২০৩০ লক্ষ্য অর্জনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বারডেম, জাতীয় পুষ্টি সেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় অন্যান্য অংশীদারদের অংশদারিত্বে একটি জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয় যা পুষ্টি, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস এর ক্ষেত্রে এই পুষ্টি নীতিমালা জনগণের পুষ্টি সচেতনতা ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। জনগণের সু-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকায়

১০টি নির্দেশাবলি এবং পুষ্টিবার্তা সংযোজন করা হয়েছে যা সাধারণ জনগণের জন্য যেমন সহজবোধ্য হবে তেমনি পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে সময়োপযোগী ধারণার প্রেরণা যোগাবে। এর মাধ্যমে জনগণ কোন খাদ্য কী পরিমাণ গ্রহণ করবে; প্রতিদিন কী পরিমাণ তেল, লবণ, চিনি ও পানি গ্রহণ করবে সে সম্পর্কেও বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা দেয়া আছে।

ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করেছে যুগোপযোগী আইন এবং সকল মানুষের জন্য পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিগুণ অনেকাংশে নির্ভর করে দক্ষ ও সতর্ক হাতে খাদ্য প্রস্তুতকরণ, খাদ্য ক্রয়, প্রস্তুতকরণ, রান্না, পরিবেশন, সংরক্ষণের সময় খাদ্য কিভাবে নিরাপদে রাখা যায় সে বিষয়ে ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে যা আজকের শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে এবং সুস্থ, সবল পরিবারের প্রয়োজনীয় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সকলকে নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে পরিবারের সকলের এ সম্পর্কে যথাযথ কল্যাণ চর্চার পাশাপাশি খাদ্যপণ্য বাছাই ক্রয়, মজুদ ও প্রক্রিয়াকরণের সময় খাদ্যকে কীভাবে নিরাপদ রাখা যায় তার বিশদ বর্ণনা এ নির্দেশিকায় রয়েছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের প্রতি শতভাগ মনোযোগী হয়ে স্বল্প জমিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের মত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কৃষিতে বীজ, সার, সেচ ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করে চলেছে। বিএডিসি নিরাপদ খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে নতুন ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনের পূর্বে বিএডিসি দীর্ঘ গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল নিরীক্ষণ করে থাকে। কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয়ের মাধ্যমে নিরাপদ কৃষির আওতায় এই দেশের ভূমির অনুকূল, অধিক উৎপাদনসক্ষম বীজ সরবরাহ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পুষ্টি ইউনিট মানুষের উন্নত পুষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ পুষ্টিতে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর সাথে গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয় করছে। এ ছাড়াও খাদ্যে ভেজালরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপদতা, গুণগতমান পরীক্ষণ, নিরাপদতার মান অনুসারে রেস্তোরার গ্রেডিং প্রদান ও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির একটি অন্যতম সূচক হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এই প্রত্যয়কে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার প্রদত্ত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পুষ্টি সংবেদনশীল দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনায় (CIP২) বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করা হচ্ছে। ভাতের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান (যেমন-জিংক, আয়রন, প্রোটিন, মিনারেলসহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো) দেহের প্রয়োজন অনুসারে চালে সংযোজন, সরবরাহ বা পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিশ্বের সর্বাধুনিক বায়োফর্টিফিকেশন ও জিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার একটি সুস্থ, সবল উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ এ পরিকল্পনার অন্যতম একটি লক্ষ্য। জাতিসংঘের উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ (Sustainable Development Goal) এর Goal-২ (Zero Hunger) এর Target ২.১ এ উল্লেখ রয়েছে। এ লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministry হিসেবে কাজ করছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। ফলে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে এবং দেশের সকল মানুষের পুষ্টি ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত হবে।

নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি একটি বহুমাত্রিক ইস্যু। প্রাণিজ খাদ্যসহ সকল খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাগুলোর সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বিত কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণসহ নিরাপদ খাদ্য আইন,২০১৩ এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। ফলে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে এবং দেশের সকল মানুষের পুষ্টি ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত হবে।

অংশীদারিত্বঃ নিরাপদ খাদ্য বাস্তবায়নে একটি সম্ভাবনাময় দিগন্ত

মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে প্রথম দিকে জড়িত থাকার কারণে এবং বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার যে পদ্ধতি প্রচলিত বা প্রচলন করা হচ্ছে তাতে এটি বিশ্বাস করার অবকাশ আছে যে এ বিশাল কর্মযজ্ঞে "সহযোগিতা" বা ইংরাজিতে "কলাবরেশন" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান বিশ্বে "সহযোগিতা" সফলতা অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই এ বিষয়ে উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করতে পারে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা, খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সিভিল সোসাইটির মধ্যে "সহযোগিতা" নিয়ে সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে 'সহযোগিতা' বা 'কলাবরেশন' বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টায় 'অন্যের সাথে যৌথভাবে বা একত্রে কাজ করা বোঝায়। এর অনেক সমার্থক শব্দ আছে যথা, অংশগ্রহণমূলক, অংশীদারিত্ব, যৌথ, এলায়েন্স ইত্যাদি। 'সহযোগিতা'র প্রধানতঃ দু'টি কাঠামো রয়েছে যথা "অংশীদারিত্ব" এবং অংশীদারিত্ব ব্যতীত অন্যকিছু অর্থাৎ "এলায়েন্স" বা বাংলায় "জোট"। লাভজনক এবং অলাভজনক প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার জন্য 'সহযোগিতা'র অন্যান্য উপযুক্ত কাঠামো ব্যবহার করতে হয়। কারণ হলো যে পক্ষগুলোর নিজস্ব স্বার্থ বজায় রেখে পারস্পরিক লাভবান হওয়া এবং পারস্পরিক লাভের জন্য পৃথক পৃথক স্বার্থ একত্রীকরণ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়। সহযোগিতার ভালো দিক এবং মন্দ দিক উভয়ই আছে এবং এ বিষয়টি এখানে আপাতত আলোচনার বাহিরে আছে। তবে 'অর্থপূর্ণ সহযোগিতা' বা 'গুড কলাবরেশন' এর ভালো দিকের পাল্লা নিঃসন্দেহে ভারী।

আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যাতে করে 'সহযোগিতা' নিয়ে আলোচনাটি সহজবোধ্য হয় যুক্তিগুলোর যৌক্তিকতা ধরা যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য প্রকৃতি; দ্বিতীয়ত, অধিক্ষেত্র বিবেচনায় খাদ্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমগুলোর সাধারণ শ্রেণিভুক্তি এবং তৃতীয়ত, খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা "মাল্টি এজেন্সি পদ্ধতি"তে গড়ে উঠছে অর্থাৎ খাদ্য নিরাপদ রাখা এবং ভোক্তাকে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান একাধিক সংস্থার মাধ্যমে অর্জিত হবে। বাংলাদেশে এই ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কিছু দেশের মত "সিংগেল এজেন্সি পদ্ধতি" বা "ইন্টিগ্রেটেড এজেন্সি পদ্ধতি" অনুসরণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে প্রত্যেক পদ্ধতির সবল এবং দুর্বল দিক রয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ স্বাধীন। এ কর্তৃপক্ষের আচরণ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তরের মত হওয়া কাম্য নয়। কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো, দ্বিতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা দেখে সন্দেহ করার অবকাশ থেকে যায় যে কর্তৃপক্ষ সে পথেই যাচ্ছে কিনা। প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষ-এর দায়িত্ব এবং আচরণ বিজ্ঞানসম্মত পথ প্রদর্শন, নির্দেশনা, সহযোগিতা প্রদানকরত সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক "এপেক্স" বডির ন্যায় হবে।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ (১), ১৩(২) এবং ১৩(৩) বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমগুলো মূলতঃ তিন শ্রেণিভুক্ত করা যায় যথা (ক) নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত যে কার্যক্রমগুলো যে সকল বিদ্যমান সংস্থাগুলো বাস্তবায়ন করছে বা

করার কথা কর্তৃপক্ষ সে সকল সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করবে। তাদের কাজ পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে; (খ) নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত কোন কাজের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত সংস্থা না থাকলে কর্তৃপক্ষ তা নিজেই করবে এবং (গ) আইনের এ ধারায় এবং অন্যান্য ধারায় অন্যান্য যে সকল কাজের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করবে।

তৃতীয়ত, খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানি, প্রি-ফার্ম এবং ফার্ম পর্যায় থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা হয়ে খাবার টেবিল পর্যন্ত এই বিশাল খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে অনেক শ্রেণির খাদ্য ব্যবসায়ী আছেন যথা আমদানীকারক, উৎপাদক, পরিবহনকারী, সংরক্ষণকারী, মজুতকারী, হোটেল-রেস্তোরা, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী, ইত্যাদি যাঁদের দায়িত্ব স্ব স্ব ধাপে খাদ্য নিরাপদ রাখা। একইভাবে ঐ একই শৃঙ্খলে সরকারের এবং স্থানীয় সরকারের অনেক সংস্থাও রয়েছে যারা খাদ্য নিরাপদ রাখার বিষয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপদেশনা প্রদান, অনুঘটকের কাজ এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এরা মূলতঃ কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সিটি করপোরেশন, অধিদপ্তর, মিউনিসিপ্যালিটি। পাশাপাশি তাঁদের এবং ভোক্তার মধ্যে 'নিরাপদ খাদ্য সংস্কৃতি" গড়ে তুলতে সুশীল সমাজের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে।

উপরের এই তিনটি বিষয় ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে এবং এর গভীরে গেলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে 'সহযোগিতা'-র উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তবে 'সহযোগিতা' নিয়ে আরো আলোচনার করার পূর্বে একটি উদাহরণ সহায়ক হতে পারে। বলাই বাহুল্য যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ণের পূর্ব থেকেই এবং সম্ভবত এখনও অনেকের মধ্যে এই প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়নি যে খাদ্যর বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে এত সংস্থা থাকার পরও সরকার কেন একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করলো? উপরন্তু, এত সংস্থা খাদ্য নিরাপদ রাখার কাজ করে যেখানে লক্ষ্য অর্জন করতে পারছেনা সেখানে কর্তৃপক্ষ কিভাবে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করবে? এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি, খাদ্য, পানি, প্রাণিসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন সংক্রান্ত প্রায় ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ১৮টি করপোরেশন ও দপ্তর, ১২টি সিটি করপোরেশন, এবং ৩৩০টি মিউনিসিপ্যালিটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রায় এক বছর পর কোন একটি অংশীদার সভায় শ্রোতামন্ডলীর পক্ষ থেকে অনুরূপ প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হলে মঞ্চ থেকে একটি উদাহরণ টেনে 'সকলের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতাই চাবিকাঠি' মর্মে জবাব এসেছিল। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে ১৯৫৯ সালের পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স জারীর উনষাট বছর পর খাদ্য দূষণ এবং ভেজাল না কমে বরং উনষাট গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যাখ্যায় সরকারের ইচ্ছা এবং নিরাপদ খাদ্য আইনের "প্রস্তাবনা"-র উদ্ধৃতি দিয়ে অবহিত করা হয়েছিল যে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ক্রয়ে নাগরিকের সামর্থ্য বৃদ্ধি, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি, খাদ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ, ভোক্তার চাহিদায় বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিবেচনা করে খাদ্য নিরাপদ রাখার বিষয়টিতে সরকার গুরুত্ব প্রদান করেছে যেখানে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সরকার দেখভালের সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করেছে। অন্যদিকে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ -এর প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে যে সরকার "... খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং তদলক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা..." করবে। দ্বিতীয়ত, নতুন এ পদ্ধতি চালু করার ফলে বিদ্যমান সংস্থাগুলোর কোন কাজ হ্রাস পাবে না বরং বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সকল সংস্থার কাজ বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। আইন কর্তৃপক্ষকে সমান্তরাল সংস্থা হিসেবে বা অন্য সংস্থার কাজ করার নিজে করার কোন দায়িত্ব প্রদান করেনি। তৃতীয়ত, এ কাজটি প্রচুর সংখ্যক এজেন্সি এবং খাদ্য ব্যবসায়ী নিয়ে বাস্তবায়িত হবে এবং সেটি বহু মাত্রিক, বহুবিধ বিষয়ক এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক। সমুদয় বিষয় সমন্বয় এবং 'রুল-অব-দা-গেম' নির্ধারণ করার জন্য কর্তৃপক্ষ-কে "এপেক্স" বডি হিসেবে সরকার দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছে। এ পরিস্থিতি ঈংগিত দেয় যে খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো 'মাল্টি এজেন্সি পদ্ধতি' এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে এখনও সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেনি। আর এ ইঙ্গিত দেয় যে মাল্টি এজেন্সি পদ্ধতি-তে 'সহযোগিতা' প্রসংগ অবধারিতভাবে এসে যায়। এটি এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। "সহযোগিতা" শব্দটি কি কি অর্থে ব্যবহার হয় বা হতে পারে, কি কি পদ্ধতিতে সহযোগিতা হতে পারে; সহযোগিতার বৈশিষ্ট্য ও নীতি এবং সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় সব সময় গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য। এ সব বিবেচনা করেই সহযোগিতা প্রদান এবং সহযোগিতা গ্রহণে অগ্রসর হতে হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-তে পারস্পরিক 'সহযোগিতা' কেন গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেয়া হলো। নিচের চার্টে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে জড়িত সংস্থাগুলো ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রেণিভাগ করে সেগুলোর কাজ এক বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

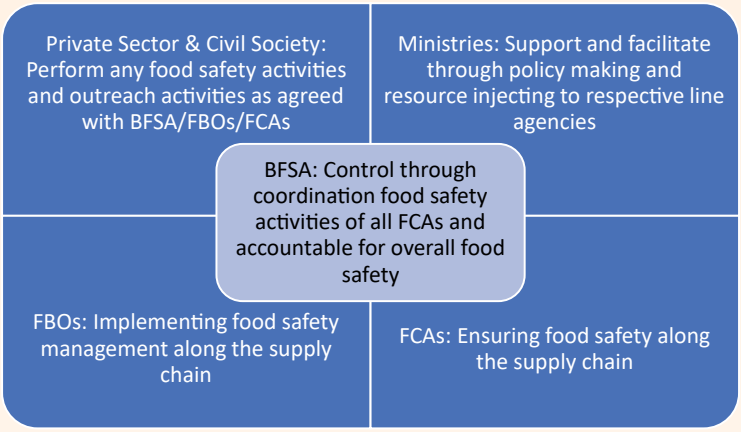

অন্যদিকে নিচের সারণিতে তৃতীয় কলামে সহযোগিতার অন্তর্নিহিত সহযোগিতার আভাস তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে সহজেই বোধগম্য যে সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সহযোগিতা ঐচ্ছিক মনে করলে ভুল হবে। মাল্টি এজেন্সি পদ্ধতিতে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু এবং বাস্তবায়ন করতে এ সহযোগিতা আবশ্যক।

সংস্থা	এক বাক্যে কার্যক্রম	অংশীদারিত্বের ঈংগিত
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং সম্পদ বরাদ্দ	নীতিমালা, সহযোগিতা, সম্মত।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	বিজ্ঞানভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতা	উদ্যোগ, সম্মত, উপদেশনা, সহযোগিতা, চাহিদা, পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ।
খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহ	সরবরাহ শৃঙ্খল নিরাপদ রাখা এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ	সহযোগিতা, সম্মত, বাস্তবায়ন, পরামর্শ, যোগাযোগ, পরিবীক্ষণ।
বেসরকারী খাত	সরবরাহ শৃঙ্খলে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন সম্মত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	সহায়তা, সম্মত, উপদেশনা, যোগাযোগ, শিক্ষা ।
সুশীল সমাজ	খাদ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ও নির্দেশনায় আউটরীচ কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন	সহযোগিতা, সম্মত, নির্দেশনা, যোগাযোগ, সচেতনতা, শিক্ষা।

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রণালয় থেকে সুশীল সমাজ পর্যন্ত পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং সহযোগিতার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই 'সহযোগিতা' কী নামে অভিহিত হবে এবং সহযোগিতার কাঠামো কী হবে তা নির্ভর করবে সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যপ্রকৃতি, অধিক্ষেত্র, ক্ষমতা এবং স্তর-এর উপর। সহজভাবে বলা যায় যে সারণির প্রথম কলামে উল্লিখিত নিচের সংস্থাগুলো উপরের সংস্থাগুলোর নিকট থেকে কোন সহযোগিতা প্রত্যাশা করলে বা মোটা দাগে কোন সহযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখ করলে সাধারণত 'সমঝোতা স্মারক' বা 'ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট" হবে। বিপরীতভাবে যে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে সাধারণত 'সার্ভিস কন্ট্রাক্ট/এগ্রিমেন্ট' হবে। তবে ব্যবসায়িক অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কাঠামো বিভিন্ন প্রকার হয়।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য এখন থেকেই এই সহযোগিতার ক্ষেত্রটি কার্যকরভাবে উন্মোচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত এবং উপযুক্ত 'সার্ভিস কন্ট্রাক্ট' স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। একইভাবে সমঝোতা স্মারক বা ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো এবং কতিপয় সংস্থা নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের অধীনস্ত সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম হবে না। ফুড সেফটি অথরিটি অব আয়ারল্যান্ড এর প্রসংগ টেনে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ঐ অথরিটি সে দেশে নিচে উল্লিখিত অফিসিয়াল এজেন্সিসমূহের সাথে সার্ভিস কন্ট্রাক্ট সম্পাদন করেছে এবং প্রতি তিন বছর পর পর তা নবায়ন করা হয়, যথা-

a) Local Authorities
b) Health Service Executive
c) The Department of Agriculture, Food and the Marine
d) The State Laboratory
e) The Marine Institute
f) The National Standards Authority of Ireland
g) The Sea Fisheries Protection Authority

শুধু তাই নয় ঐ অথরিটি নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের অপরাপর বিষয়ে নিচে বর্ণিত বিভাগ/সংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে যথা

a) The Dept of Agriculture, Food and Marine, Enterprise Ireland, Bord Bia and Teagasc
b) Bord Iascaigh Mhara (BIM)
c) Environmental Protection Agency (EPA)
d) Food Standards Agency (Northern Ireland)
e) Health Products Regulatory Authority (HPRA)
f) Loughs Agency
g) Revenue's Customs Service
h) Safefood

সমঝোতা স্মারকগুলো স্ব স্ব সংস্থার নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক এবং সার্ভিস কন্ট্রাক্টগুলো নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত বিধি-বিধানের প্রয়োগের আইনগত ভিত্তি।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যদি সহযোগিতা চুক্তি, সমঝোতা স্মারক বা কনট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, সম্পাদন না করে থাকে তবে কালবিলম্ব না করে এই কাজে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উত্তম হবে। এটা সব সময় মেনে নেয়া কঠিন যে প্রায় সকল খাদ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বা ততোধিক সংস্থা পরিদর্শন করে; এখনও ছয়/সাতটি প্রতিষ্ঠান মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে; উৎপাদিত ব্যাচ থেকে দৈব চয়নের লিখিত পদ্ধতি ব্যতিত হাট-ঘাট-মাঠ থেকে খাদ্য নমুনা সংগ্রহ (নমুনা সংগ্রহের পরিমাণ পদ্ধতি বা নমুনা ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ নয়) করা হয়; খাদ্য ঝুঁকি নির্ধারণ এবং গেজেট না করে ইচ্ছে/মর্জি মাফিক খাদ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে একবিংশ শতাব্দীতে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো গ্রহণযোগ্য। পাশাপাশি খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্যও কর্তৃপক্ষকে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর নিজস্ব "কোর এ্যাকটিভিটি" আছে এবং সংস্থাগুলোর সেসব বাস্তবায়নে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ কারণে নিরাপদ খাদ্য'র বিষয়ে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় জনবল, বাজেট বরাদ্দ, প্রযুক্তি এবং গাইডলাইন না পাওয়ার ফলে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেনা।

একটি নতুন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতি পর্ব এবং ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। তবে কিছু কিছু কার্যক্রম সময়োপযোগী কিনা তা বিবেচ্য। একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যাশা আরো বেশি আর তা হলো যে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। গতির অভাবে পিছিয়ে গেলে বা শূন্যতা সৃষ্টি হলে তা সংস্থার টিকে থাকার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। এমন সব ক্ষেত্রে কেউ না কেউ সে শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে খাদ্য ব্যবসায়ী পর্যন্ত এ কথা সকলকে বুঝতে হবে যে "মাল্টি এজেন্সি পদ্ধতি"র সকল চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় এনে অধিদপ্তরের মত আচরণ পরিহার করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-কে বিজ্ঞানসম্মত পথ প্রদর্শন, নির্দেশনা, সহযোগিতা প্রদানকরত সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক "এপেক্স" বডির ন্যায় চলতে হবে এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং জাতি গঠনের জন্য একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশের লবণ শিল্প: সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম
সদস্য (খাদ্য শিল্প ও উৎপাদন)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা:- লবণ (NaCl) একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। সোডিয়াম ক্লোরাইড সাধারণত খাবার লবণ বা টেবিল সল্ট হিসেবে পরিচিত। সোডিয়াম ক্লোরাইড ১ : ১ ভাগ অনুপাতে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সমন্বয় গঠিত একটি আয়নিক যৌগ। আণবিক ভর অনুসারে ২২.৯৯ গ্রাম সোডিয়াম ও ৩৫.৪৫ গ্রাম ক্লোরিন থাকে। অর্থাৎ ১০০ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে ৩৯.৩৪ ভাগ সোডিয়াম এবং ৬০.৬৬ ভাগ ক্লোরিন থাকে। খাদ্যে খাবার লবণ খাদ্য সংযোজন দ্রব্য (Food Additives) বা খাদ্য সংরক্ষণকারী (Preservative) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড খাবারের গন্ধ ও স্বাদ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। খাবার লবণ থেকে আমাদের শরীরের অত্যাবশ্যক পুষ্টি হিসাবে সোডিয়াম পেয়ে থাকি। সোডিয়াম অত্যাবশ্যক কিন্তু সামান্য পরিমাণ দরকার। খাবার ছাড়াও শিল্পখাত, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রাণিসম্পদ খাতেও লবণের ব্যবহার রয়েছে। আমেরিকার ডায়েটরী গাইড লাইনস অনুসারে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন ২.৩ গ্রাম সোডিয়াম দরকার এবং ১৪ বছর নিচের বয়সের শিশুদের জন্য সোডিয়ামের দরকার আরও কম। WHO-এর মতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রাম এর কম খাবার লবণ খাওয়া উচিত এবং শিশুদের ক্ষেত্রে আরও কম। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যাদের জনগণের প্রতিদিন লবণ খাওয়ার সঠিক হিসাব নাই। বাংলাদেশ সেরকমই একটি দেশ। তবে বিভিন্ন তথ্য মতে ধারণা করা হয় প্রতিদিন ১৪ গ্রাম করে লবণ আমরা খেয়ে থাকি যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। লবণের কোন বিকল্প নেই। লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হওয়ায় দেশে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে লবণ শিল্পের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লবণ উৎপাদন এলাকা ও মৌসুম:- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) সাধারণত নভেম্বর মাস হতে মে মাস পর্যন্ত লবণ উৎপাদন মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয় তন্মধ্যে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততা বেশি থাকায় এ সময়ে অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

লবণ চাষ (উৎপাদন) পদ্ধতি:- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) দোআঁশ-এটেল মাটিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ব্যবহার করে (কমপক্ষে ১৫ পিপিটি) এবং সৌরতাপকে কাজে লাগিয়ে লবণ উৎপাদন করা হয়। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জমিকে আইলের মাধ্যমে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে স্বল্প উচ্চতায় লবণাক্ত পানি ধরে রেখে তা সৌরতাপে বাষ্পীভূত করে লবণ চাষ করা হয়। লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য বর্তমানে লবণ মাঠে পলিথিন শীট ব্যবহার করে লবণ উৎপাদন করা হয়।

লবণ পরিশোধন ও বাজারজাতকরণ:- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে উৎপাদিত ক্রুড/অপরিশোধিত লবণ ৮টি লবণ জোনে অবস্থিত লবণ মিলসমূহের মাধ্যমে পারিশোধন করা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২০ এর নির্দেশিত মানদণ্ড অনুযায়ী পরিশোধিত লবণে আয়োডিনের উৎস হিসেবে পটাশিয়াম আয়োডেট মিশিয়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ হিসেবে প্যাকেটজাত করা হয়। লবণ মিলসমূহ নির্ধারিত পরিমাণে অনুমোদিত ব্রাণ্ডের নামে প্যাকেটজাত আয়োডিনযুক্ত লবণ পাইকারি/খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে সরবরাহ করে থাকে। ভোক্তগণ পাইকারি/খুচরা বিক্রেতা পর্যায় হতে প্যাকেটজাত আয়োডিনযুক্ত লবণ ক্রয় করেন।

আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগ প্রতিরোধে ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ:- আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা একটি জনস্বাস্থ্যমূলক সমস্যা। আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা নিরসনকল্পে আয়োডিনযুক্ত লবণের মাধ্যমে আয়োডিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২০ অনুযায়ী ভোজ্য লবণ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য (মৎস্য ও পশু খাদ্য) প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত সকল লবণ আয়োডিনযুক্তকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিসিক

কর্তৃক নিবন্ধনকৃত ভোজ্য লবণ উৎপাদনকারী লবণ মিলসমূহকে পটাশিয়াম আয়োডেট ও আয়োডিন যুক্তকরণ মেশিন সরবরাহ, কারিগরি সহায়তা এবং মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ভোক্তা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমে বিসিক সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা হিসেবে ইউনিসেফ, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (এন আই) এবং গেইন এ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছে।

লবণ শিল্পে কর্মসংস্থান:- লবণ মাঠে চাষ, লবণ মিলসমূহে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয়োডিনমুক্তকরণ এবং পাইকারী/খুচরা লবণ বিক্রি ইত্যাদি পর্যায়ে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে। লবণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে দিন দিন এ শিল্পে সম্পৃক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান।

লবণ ব্যবহারের খাতসমূহ:- ব্যবহার অনুযায়ী লবণকে ৪ (চার) টি খাতে ভাগ করা হয়েছে যেমন- ১. ভোজ্য লবণ; ২. মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ; ৩. প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ ও ৪. শিল্পের কাঁচামাল সহযোগি হিসেবে ব্যবহৃত লবণ

১. **আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ:-** মানুষ প্রতিদিন সকল প্রকার খাদ্যে যে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করে থাকে তাকেই ভোজ্য লবণ হিসেবে ধরা হয়। প্রস্তাবিত আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন২০২০- অনুযায়ী আয়োডিনযুক্ত লবণে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ থাকবে যথা:- ক) অন্যূন ৯৬% ওজনের সোডিয়াম ক্লোরাইড; খ) অনধিক ১.০% ওজনের পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ; গ) অনধিক ৩.০% ওজনের পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ; ঘ) উৎপাদন পর্যায়ে ৩০-৫০ ওজনের সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যতীত, পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ; এবং ঙ) জলীয় অংশের পরিমাণ অনধিক ৬.০ শতাংশ।

২. **মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণ:-** আমাদের দেশে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে লবণ ব্যবহৃত হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত লবণে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, বিধিমালা এবং বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস) এ বর্ণিত পরিমাণ অনুযায়ী উপাদানসমূহ থাকবে।

৩. **প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ:-** গবাদি পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয়। মানুষের পাশাপাশি মৎস্য ও গবাদি পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুতেও আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৪. **শিল্পের কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ:-** কিছু কিছু শিল্প কারখানায় পণ্য উৎপাদনে লবণ ব্যবহৃত হয়। শিল্পের কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

i). শিল্পের প্রধান কাচামাল হিসেবে লবণের ব্যবহার; নির্দিষ্টমানের লবণ ব্যবহার করে লবণ থেকে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

ii). শিল্পের প্রধান কাঁচামালের সহযোগি কাঁচামাল হিসেবে লবণের ব্যবহার; যেমন- সাবান ও ডিটারজেন্ট প্রস্তুতকরণ, চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, আইস প্লান্ট, কাপড় ও পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকরণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার ইত্যাদি। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস ১৪) রয়েছে। বিডিএস-১৪ এ শিল্প খাতে ব্যবহৃত লবণের জন্য ২টি পৃথক গ্রেড রয়েছে যা নিম্নরূপ:

টেবিল নং-১: বিডিএস-১৪ এ শিল্প খাতে ব্যবহৃত লবণের জন্য ২টি পৃথক গ্রেড

ক্রমিক নং	উপাদান	গ্রেড-১	গ্রেড-২
১	সোডিয়াম ক্লোরাইড নুন্যতম (শতাংশ)	৯৮.০	৯৪.০০
২	পানিতে দ্রবনীয় পদার্থ অনধিক (শতাংশ)	০.২৫	২.০
৩	ক্যালসিয়াম অনধিক (শতাংশ)	০.২০	০.৬৫
৪	ম্যাগনেসিয়াম অনধিক (শতাংশ)	০.২০	০.৫৫
৫	সালফেট অনধিক (শতাংশ)	১.০	৩.৫
৬	কার্বোনেট অনধিক (শতাংশ)	০.১০	০.১০

বছর ভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরূপণ

২০২১-২০২৫ মেয়াদে ভোজ্য লবণের চাহিদা নিরূপণ:- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সালে দেশে জনসংখ্যা ছিলো ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন এবং Sample Vital Registration (SVRS) অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের ধারাবাহিকতা যথাক্রমে ২০২১ সালে ১.৩৪% ২০২২ সালে ১.২৪%, ২০২৩ সালে ১.২২%, ২০২৪ সালে ১.১৯% এবং ২০২৫ সালে ১.১৮% । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারকে ভিত্তি ধরে ২০২১ থেকে ২০২৫ সালে পর্যন্ত বছর ভিত্তিক জনসংখ্যা হিসেব করা হয়েছে । জাতীয় লবণ নীতি ২০১৬ এ জনপ্রতি প্রতিদিন ভোজ্য লবণ গ্রহণের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১৪.৫০ গ্রাম । যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিন দিন লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমানোর বিষয়ে সুপারিশ করেছে, সেহেতু জনপ্রতি প্রতিদিন ভোজ্য লবণ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪.০০ গ্রাম । সে হিসেবে বছর ভিত্তিক ভোজ্য লবণের চাহিদা নিম্নরূপঃ

টেবিল নং-২: জনপ্রতি প্রতিদিন ভোজ্য লবণ গ্রহণের পরিমাণ (১৪.০০ গ্রাম) নির্ধারণ

অর্থ বছর	জনসংখ্যা (লক্ষ জন)	জনপ্রতি দৈনিক ভোজ্য লবণের চাহিদা	পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)
২০২০-২১	১৭,২০,৯৪,০০০	১৪.০০	৮.৭৯
২০২১-২২	১৭,৪২,৩৫,০০০	১৪.০০	৮.৯
২০২২-২৩	১৭,৬৩,৬৫,০০০	১৪.০০	৯.০১
২০২৩-২৪	১৭,৮৪,৮২,০০০	১৪.০০	৯.১২
২০২৪-২৫	১৮,০৬,০৩,০০০	১৪.০০	৯.২৩

২০২০-২০২৫ সন মেয়াদে খাত ভিত্তিক বাৎষরিক লবণের মোট চাহিদা নিরূপণ:- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত বার্ষিক "লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং" কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপিত হয়েছে । তবে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রতিবছর বাস্তবতার আলোকে লবণের চাহিদা প্রয়োজনে পুণ:নিরূপণ করতে পারবে ।

টেবিল নং-৩ বিভিন্ন খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেট্রিক টন)

অর্থবছর	ভোজ্য লবণের বার্ষিক চাহিদা	শিল্পখাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা	মৎস্য খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা	প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের বার্ষিক চাহিদা	পরিশোধিত লবণের মোট চাহিদা	মোট অপরিশোধিত লবণের চাহিদা (১৭% প্রক্রিয়াজাত করণ ক্ষতি ধরে)
২০২০-২১	৮.৭৯*	৬.২৯	০.০১	৩.৩১	১৮.৪১	২২.১৭৬
২০২১-২২	৮.৯	৬.৯২	০.০১	৩.৩৬	১৯.২	২৩.১২৭
২০২২-২৩	৯.০১	৭.৯৬	০.০১	৩.৪১	২০.৩৯	২৪.৫৬৯
২০২৩-২৪	৯.১২	৯.১৫	০.০১	৩.৪৫	২১.৭৩	২৬.১৮৫
২০২৪-২৫	৯.২৩	১০.৫২	০.০১	৩.৫০	২৩.২৭	২৮.০৩

*জনপ্রতি ১৪ গ্রাম হিসাবে

লবণ আমদানির তথ্য:- ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানিকৃত লবণের তথ্য নিম্নরূপ:

টেবিল নং-৪ বিভিন্ন অর্থবছরে আমদানিকৃত লবণের পরিমাণ

অর্থ বছর	আমদানির পরিমাণ (লক্ষ মে. টন)	চাহিদা (লক্ষ মে. টন)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
২০১৪-১৫	২.০০	১৬.৫৮	১২.৮২
২০১৫-১৬	২.৫০	১৬.৫৮	১৫.৫৫
২০১৬-১৭	৫.০০	১৭.৭৬	১৩.৬৪
২০২১-২২	১.৫	২৩.৩৫	১৮.৩২

বিভিন্ন পর্যায়ে লবণের গড় মূল্য:- ক্রুড লবণ, শিল্প লবণ ও আয়োডিনযুক্ত লবণের বিভিন্ন পর্যায়ে গড় মূল্য নিম্নরুপ:

টেবিল নং-৫ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতি কেজি লবণের গড় মূল্য (টাকায়)

লবণের ধরণ		লবণ মাঠ পর্যায়ে	লবণ মিল পর্যায়ে	ডিলার/পাইকারী পর্যায়ে	খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে
ক্রুড লবণ		১০.৫০	১২.২০		
শিল্প লবণ		-	১৬.০০	১৯.০০	২০.০০
আয়োডিনযুক্ত প্যাকেট লবণ	ট্রেডিশনাল	-	১৭.০০	২০.০০	২২.০০
	মেকানিক্যাল	-	২২.০০	২৬.০০	২৮.০০
	ভ্যাকুয়াম	-	২৮.০০	৩০.০০	৩৮.০০

তথ্য সূত্র: লবণ সেল, বিসিক

লবণ শিল্প উন্নয়নে গৃহীত কৌশলসমূহ:- বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় লবণ নীতি ২০২০-এ নিম্নে বর্ণিত কৌশল সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) **লবণ উৎপাদনে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগ:-** লবণ উৎপাদনে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পরিপক্ব ও গুণগত মানসম্পন্ন লবণ উৎপাদন সম্ভব হয়। অল্প জমিতে অধিক লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পলিথিন পদ্ধতির প্রয়োগ একটি কার্যকর পদ্ধতি।

খ) **কালো লবণ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধকরণ:-** দেশে লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত মান রক্ষা এবং উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য লবণচাষী কর্তৃক কালো লবণ উৎপাদন করা নিষিদ্ধ থাকবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিসিক কালো লবণ উৎপাদন বন্ধের জন্য প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখবে।

গ) **একর প্রতি গুণগত মানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ:-** লবণ চাষকৃত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে লবণ চাষের জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণে লবণ উৎপাদণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) লবণ চাষকৃত এলাকায় উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সহায়তায় লবণ গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে গুণগত মানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ঘ) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ:-** লবণ মৌসুমে লবণ চাষীদের আকস্মিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার্থে তথ্য মন্ত্রণালয় ও আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্প্রচার করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ; ঝড়, জলচ্ছাস ও বন্যার কবল থেকে লবণ চাষ যোগ্য জমি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় বেড়িবাধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামতের ব্যাপারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিসিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ঙ) **লবণের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণসহ আপাদৎকালীন সময়ের জন্য বাফার স্টকের ব্যবস্থা গ্রহণ:-** আপাদৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতির সহায়তায় বিসিক ১.০০ (এক) লক্ষ মে. টন লবণের বাফার স্টক নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সহযোগিতা প্রদান করবে। উপযুক্ত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে লবণ সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় টিসিবির প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্যাকেটজাত আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ সংগ্রহ করে ভোক্তাতের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করবে। ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে লবণ মজুদ আছে ১.৫২ লক্ষ মে. টন ও মিল পর্যায়ে ১.৬০ লক্ষ মে. টন। মোট মজুদ আছে ৩.১২ লক্ষ মে. টন।

চ) **সহজশর্তে লবণ চাষীদের ঋণের ব্যবস্থাকরণ:-** প্রান্তিক লবণচাষীদের আর্থিক সংকট দূরীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত "কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমাল" এবং কর্মসূচীতে কৃষি ঋণের একটি বিশেষ খাত হিসেবে লবণ চাষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চাষীদের ঋণ প্রদান, সরকার প্রদত্ত সুদ, ক্ষতি পুনর্ভরণ ও লবণচাষের জন্য লবণ চাষীদের রেয়াতি সুবিধা প্রদান ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। এছাড়া লবণ চাষীদেরকে সহজশর্তে অল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বিসিকি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ছ) **শিল্পে ব্যবহার উপযোগী লবণ উৎপাদন:-** দেশে শিল্পে ব্যবহার্য লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিসিক ও বিসিএসআইআর যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কোন শিল্পের জন্য কিধরণের লবণ প্রয়োজন এ সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা করবে।

জ) **আয়োডিনযুক্ত লবণ ২০২০, বিধিমালা এবং বিডিএস মোতাবেক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ:-** আয়োডিনযুক্ত লবণ ২০২০, বিধিমালা এবং বিডিএস মোতাবেক নির্ধারিত মাত্রায় লবণে আয়োডিনযুক্তকরণের মাধ্যমে নিবন্ধিত লবণ মিল কর্তৃক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে। ভোক্তা পর্যায়ে সঠিকমাত্রায় গুণগত মান-সম্পন্ন আয়োডিনযুক্ত লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করবে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিসিক এবং বিএসটিআই নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

ঝ) **লবণ উৎপাদনে পরিবেশ বান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ:-** অল্প জমিতে গুণগত মানের অধিক লবণ উৎপাদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পরিবেশ বান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, পাইলটিং, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঞ) **পরিবেশ বান্ধব লবণ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা:-** লবণ শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষের জন্য এবং লবণ প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণের জন্য লবণ মিল সমূহকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব লবণ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে।

ট) **লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সম্প্রসারণ:-** লবণ উৎপাদন অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে লবণ চাষের জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশে লবণের চাহিদা মিটিয়ে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে লবণ চাষের নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করে বিসিক লবণ চাষ এলাকা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ঠ) **প্রকৃত লবণ চাষীদের নিকট লবণ চাষের জমি বরাদ্দকরণ:-** লবণের জমি লিজ গ্রহণ করতে লবণ চাষীদের উচ্চমূল্য প্রদান করতে হয়। লবণ উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য প্রকৃত লবণ চাষীদের নিকট লবণ চাষের জমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ড) **লবণ আমদানি বিষয়ে শুল্কহার সমন্বয়:-** বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন লবণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা করে দেশে উৎপাদিত লবণ শিল্পকে সুরক্ষা দিতে বিভিন্ন লবণের আমদানি শুল্কহার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঢ) **লবণ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:-** সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন, পরিবহণ, মজুদ ও বাজারজাতকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিসিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে।

উপসংহার:- সোডিয়াম রক্তে বেশি হলে পানিকে আকর্ষণ করে বা টানে যার ফলে রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মানুষের শরীরে রক্তের চাপ বেড়ে যায়। রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। বেশি পরিমাণ লবণ খাওয়াকে হাইপারটেনশনের কারণ হিসাবে ধরা হয়। হাইপারটেনশনের কারণে উচ্চ শক্তিতে মানুষের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় যার ফলে আর্টারিজ (Arteries), হার্ট (Heart), কিডনি (Kidney), ব্রেন (Brain) ও চোখের (Eyes) ক্ষতি হয়। নিয়ন্ত্রনহীন উচ্চ রক্তচাপের কারণে বৃদ্ধি পায় হার্ট এ্যাটাক (Heart Attack), হার্ট ফেইলর (Heart Failure), স্ট্রোক (Stroke), কিডনি ডিজিজ (Kidney Disease), অন্ধত্ব (Blindness) ইত্যাদি। সর্বোপরি বলতে চাই সুস্বাস্থ্যের জন্য লবণ খাওয়া সীমিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ব্রয়লার ও নেতিবাচক বাঙ্গালি

প্রফেসর ড. খান মো: সাইফুল ইসলাম
পশু পুষ্টি বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইনিং টেবিলে তিন চার ধরনের মাংসসহ অভিজাত খাবার পরিবেশন করলেও কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে স্নেহ বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুরগীর থাইপিস/রানের মাংস প্লেটে তুলে দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু কেন ? পর্যাপ্ত খাবার থাকার পরও কেন এই বিশেষ মাংস টুকরা আলাদাভাবে তুলে দিতে হবে ? কী আছে এই থাইপিস/রানের মাংসে ? কেউ কেউ হয়ত বলবেন এটি বাঙ্গালির ঐতিহ্য। তা বলতে পারেন। তবে তা গর্ব করে বলবেন না। কারণ, এক সময় আমরা যে কম মাংস খেতে পেতাম সেটিই প্রতিফলিত হয় এই ঐতিহ্য প্রকাশের মাধ্যমে।

ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর পূর্বেও আমরা মোরগ-মুরগী বলতে কেবল মাত্র দেশী মোরগ মুরগীই বুঝতাম। তখনও উন্নত জাত ও বাণিজ্যিক মোরগ মুরগী তেমন প্রচলন হয়নি। দেশী মোরগ-মুরগী কেবলমাত্র রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট ও কিছু খৈল ভূষি দিয়েই লালন পালন করা হতো। এদেশের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এদের অনেক বেশি। এদেশের আবহাওয়ায় খাপ খেয়ে বেঁচে থাকলেও এদের দৈহিক বৃদ্ধি ও ডিম উৎপাদন ক্ষমতা কম। এদের পরিপূর্ণ দৈহিক বৃদ্ধি অর্জনে সময় লাগে প্রায় ২৪ সপ্তাহ। একজন গৃহিণী লম্বা সময় ধরে সযত্নে লালন পালন করেন এবং বিনিময়ে সামান্য পান সামান্য মাংস। ফলে তার কাছে মুরগীর মাংস অনেক মূল্যবান। তাই যখন মেহমান দাওয়াত করা হতো কেবল তখনই মুরগীর মাংস রান্না করা হতো। তখন স্বচ্ছল পরিবার কম থাকার কারণে হয়ত রান্না করার জন্য দু'য়েকটি মুরগী সংকুলান সম্ভব হতো। যেহেতু মুরগী খোলা অবস্থায় ঘুরে ফিরে খাবার খেত তাই বন্য পাখির মত এদের দেহে হাড়ের তুলনায় মাংস অনেক কম। তবে থাইপিস/রানের মাংসে অপেক্ষাকৃত বেশি মাংস পাওয়া যেত। তাই মুরগীর রানের মাংস মেহমানের পাতে তুলে দেয়া বাঙ্গালির ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে, বাঙ্গালি আনেক পূর্ব থেকেই গরীব ছিল। এ ছাড়াও প্রমাণ করে যে, প্রাণীজ আমিষের অভাব ছিল এই অঞ্চলের মানুষের।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে আসেন বিজ্ঞানীগণ। উদ্ভাবিত হয় উচ্চ উৎপাদনশীল ব্রয়লার মুরগী সহ ডিম উৎপাদনশীল মুরগী। ব্রয়লার মুরগী পঁয়ত্রিশ দিন পালন করলে এর দৈহিক ওজন হয় প্রায় দুই কেজি। অথচ একটি দেশী মুরগী কখনোই ৩৫ দিনে দুই কেজি ওজন হবে না। বরং এক কেজি ওজন হতে সময় লাগে প্রায় ২৪ সপ্তাহ। বিষয়টিকে যদি অন্যভাবে উপস্থাপন করি তবে ব্রয়লার মুরগীর উৎপাদন ক্ষমতা দেশী মুরগীর তুলনায় প্রায় ২৪ গুণ বেশি। অবাস্তব মনে হচ্ছে তাই না ? আসুন হিসেব করে দেখি।

মনে করি একটি দেশী মুরগীর ওজন ২৪ সপ্তাহে হয় ১ কেজি। আবার মনে করি ৪ সপ্তাহে (প্রায়) একটি ব্রয়লার মুরগী পাওয়া যায়, যার ওজন ২ কেজি (প্রায়)। অর্থাৎ একটি ব্রয়লার মুরগী একটি দেশী মুরগীর তুলনায় ২ গুণ (১ কেজির স্থানে ২ কেজি) মাংস উৎপাদন করছে। তাহলে ২৪ সপ্তাহে ৬ (৪×৬=২৪) বার ব্রয়লার পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে দেশী মুরগী পাওয়া যাবে মাত্র একবার। অর্থাৎ সংখ্যার দিক দিয়ে ৬ গুন এবং ওজন বিবেচনায় ২ গুন বেশি উৎপাদন হবে। এছাড়াও ব্রয়লার মুরগীর খাদ্যকে মাংসে রূপান্তরের দক্ষতা প্রায় ২ গুণ। যেমন দেশী মুরগীর ১ কেজি ওজন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় আনুমানিক ৪ কেজি খাদ্য। অন্য দিকে ব্রয়লার মুরগীর ১ কেজি ওজন বৃদ্ধিতে প্রয়োজন প্রায় ২ কেজি খাদ্য (অনেক ক্ষেত্রে ১.৫ কেজি)। এমতাবস্থায় বয়স (৬ ভাগ কম), চূড়ান্ত ওজন (২ গুণ বেশি) এবং খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা (২ গুণ বেশি) একসঙ্গে বিবেচনা করলে দেশী মুরগীর তুলনায় ব্রয়লার মুরগীর উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ গুণ (৬দ্ধ২দ্ধ২)। তাই আমরা বর্তমান সময়ে প্রাণীজ আমিষ আগের তুলনায় বেশি খেতে পারি।

ব্রয়লার মুরগীর বয়স কম থাকার কারণে এর মাংসে চর্বি কম থাকে। ফলে আমরা কম স্বাদ অনুভব করি। কারণ চর্বি স্বাদ বৃদ্ধি করে। চর্বির কণাই মূলত জিহ্বায় বিদ্যমান টেস্ট বাদে স্বাদের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সেই বিবেচনায় ব্রয়লারের মাংস যে কোন মাংসের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত। বাংলাদেশের মত গরীব দেশে এটি একটি সুলভ ও গুরুত্বপুর্ণ আমিষ উৎস। কারণ এটি সহজলভ্য বিধায় গরীব মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু বাঙ্গালি জাতি ব্রয়লারের মূল্য কম থাকার কারণে ব্রয়লার মাংসকে উপেক্ষা করা শুরু করে।

গরীব মানুষ যখন ধনী হয় তখন সে কোন কিছুর মান আর্থিক মূল্য দিয়ে বিবেচনা করে। এটি তার সহজাত প্রকৃতি। তাই যখন অর্থ বেশি হয় কিংবা কোন কিছু সহজে পাওয়া যায় তখন সে তার অবমূল্যায়ন করে। অবমূল্যায়নের পক্ষে সে সকল যুক্তি উপস্থাপন করে। ব্রয়লার মুরগীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই অবস্থা। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সকল দোষ এই ব্রয়লার মাংসের উপর চাপিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে এদেশে।

কিছু কিছু এন্টিবায়োটিক ব্রয়লায়ের দৈহিক বৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয়। তবে যদি মাংসে একটি নির্ধারিত মাত্রার বেশি থাকে তবে তা মাংস গ্রহণকারীর শরীরে প্রবেশ করে। ফলে ঐ এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুর প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। যা ক্ষতিকর। তাই ইউরোপে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পরিপুর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। তবে ইউএসএ তে নিষিদ্ধ না করে ব্রয়লার বাজারজাতকরণের পূর্বে একটি নির্ধারিত সময় খাদ্যে এটি না দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছে। আমরা সবচেয়ে ভালটি করতে চেয়ে ইউরোপকে অনুসরণ করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি। যদিও ইউরোপ ২০০২ সালে সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৬ সালে কার্যকর সাপেক্ষে। কারণ তারা খামারীদের কথা বিবেচনা করে তাদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ক্ষুদ্র খামারির পক্ষে এই বিধি দ্রুত মানা সম্ভব কিনা তা বিবেচনা না করেই নিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন। খামারীরা কি বিধি নিষেধ অনুসরণ করছে? বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী কি খামারীকে তা অনুসরন করতে বলছে ? তবে ক্ষুদ্র খামারীরা খামারের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারার কারণে বিধি নিষেধ মানছে না। সবাই সবকিছু দেখছি, জানছি, বুঝছি। বাঙ্গালি নিজেরাই নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে না পেরে সকল দোষ দিচ্ছে ব্রয়লারকে।

বাঙ্গালি নেতিবাচক জাতি। আমরা সবসময় নেতিবাচক কথা বলি, নেতিবাচক বিষয় সহজেই বিশ্বাস করি, নেতিবাচক বিষয় প্রচার করি। আর তাই নেতিবাচক বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের নামের প্রসার লাভ করতে চাই। তাই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ থেকে ট্যানারি বর্জ্যের উপর ক্রটিপূর্ণ গবেষণা করে নিজেকে জাহির করি। যেন ব্রয়লার মুরগীর প্রতিটি কোষ ক্রোমিয়ামে ভরা। যা সঠিক নয়। বরং ক্রোমিয়াম মানুষের শরীরের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু সকল দোষ ঐ ব্রয়লার মুরগীর। ব্রয়লারের কথা মনে হলেই বিষাক্ত কিছুর কথা মনে হয়। মনে হয় ব্রয়লার খেলেই আমরা মরে যাব। আরে ভাই ব্রয়লার নিজেই তো প্রাণী। লাভজনক দৈহিক বৃদ্ধি না হলে খামারী খাওয়াবে কেন ? আর স্বাভাবিক বৃদ্ধিই প্রমাণ করে ব্রয়লারের জন্য এটি ক্ষতিকর না। তাহলে কেবল সামান্য মাংস খেয়ে মানুষের জন্য কেন ক্ষতিকর হবে? মানুষের পরিপাকক্রিয়া আর ব্রয়লারের পরিপাকক্রিয়া তো একই রকম। তাই ক্রোমিয়াম সংক্রান্ত গুজব ভিত্তিহীন। সুতরাং কেবলমাত্র বাঙ্গালির নেতিবাচক মানসিকতাই বিরুপ প্রভাব ফেলেছে এধরনের গবেষনা ও ব্রয়লার মাংস খাওয়ায় মানুষের ভীতি সৃষ্টিতে।

ক্ষুদ্র খামারীরা নির্ভর করছে হ্যাচারী, ফিড মিল, ডিলার, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী সহ বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর।

যার কারণে তাদের প্রকৃত লাভ কম হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান না থাকার কারনে রোগ সংক্রমনের ঝুকি কমানোর জন্য নিয়মিতভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে থাকে ব্রয়লার পালনে। ফলে খরচ আরও বেড়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে ব্রয়লার মাংসের বাজারে টিকে থাকতে পারছে না ক্ষুদ্র খামাররিা। তাই কম দামে এমন খাদ্য খামারীরা আশা করে যার খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা অনেক বেশি। কিন্তু কীভাবে সম্ভব ? ছোট খামারীদের অতিমাত্রায় উৎপাদন খরচ কিভাবে সমন্বয় করবে খাদ্য রুপান্তরের মাধ্যমে। বিভিন্ন ফিড মিল কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এমন ফিড বাজারজাত করবে ? এর উত্তর সহজেই পাওয়া যায় যখন দেখা যায় কোন কোন ফিড মিলের ফিডের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ১.২ অর্থাৎ ১.২ কেজি খাদ্য খেয়ে ১ কেজি দৈহিক বৃদ্ধি। এটি স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ছোট খামারীকে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে এর কোন বিকল্প নেই। প্রকারান্তরে আমরা হয়ত মাংসের মাধ্যমে এমন কিছু গ্রহন করছি যা খাদ্যে যোগ করা আইনগত সিদ্ধ নয়। বাংলাদেশের কোন ল্যাব এ এটি পরীক্ষা করে কেউ কি বলতে পারবেন ? এখানেও নেতিবাচক বাঙ্গালিয়ানা আর নির্ভরশীলতার অভাব।

সকল দোষই ব্রয়লারের। নেতিবাচক প্রচারনায় নেমেছে ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক সহ অসংখ্যা মিডিয়া। তারা ব্রয়লারকে প্রচণ্ডভাবে দোষারূপ করছে। ব্রয়লার খাবেন তো মরে যাবেন। আর বাঙ্গালিও এসব প্রচারণা দেখে চ্যানেলের ভিউ বাড়াচ্ছেন যার বিনিময়ে চ্যানেল কামাই করে নিচ্ছে অনেক অর্থ। ওরা বাঙ্গালির নেতীবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজি করে ব্যবসা করছে। বিনিময়ে পোল্ট্রি শিল্পের বারটা বাজছে।

আমাদের ধর্মযাজকরাও কম যান না। বিভিন্ন ওয়াজের মাধ্যমে প্রমান করতে চান যে ব্রয়লার হারামের চেয়েও খারাপ কিছু। বিজ্ঞানীরাও কম নন। কেউ কেউ বলেন ব্রয়লার খেলে ডায়াবেটিস বাড়ে কারণ এর শরীরে রয়েছে সুগার। ওরে পাগল যেকোনও মাংসে সুগারের পরিমাণ নগন্য। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্য অনুষঙ্গ এর প্রচারনা করতে গিয়ে বলা হয় যে ঐ প্রোডাক্ট ব্রয়লারকে খাওয়ালে ব্রয়লারের শরীরে ক্যান্সারের যে কারন রয়েছে তা থাকবে না। মনে হয় যেন ব্রয়লার ক্যন্সারের কারণ। মিডিয়া কোন কিছুকে বেশি ভাল বলতে গিয়ে যে গুরুত্বপূর্ন কিছুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ল তা বুঝতে পারে না। কখনও কখনও সংবাদ মাধ্যমও ব্রয়লারকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। কারন স্বভাবগত কারনে বাঙ্গালি নেতিবাচক সংবাদ বেশি পছন্দ করে।

সকল দোষ ঐ ব্রয়লারের। তাই বাঙ্গালি ঝুকছে সোনালী, ককরেল সহ সেই দেশী মুরগীর দিকে। দাম যত বেশিই হোক। হায়রে হতভাগা ভোক্তা বাঙ্গালি তোমরা কি ভুলে গেছ যে খামারীরাও তো আমরা সেই বাঙ্গালি। ব্রয়লার ফিডই খাওয়ানো হচ্ছে ঐ সমস্ত মুরগীকে। দৈহিক বৃদ্ধি তো বেশি হবেই। যে ভয়ে ব্রয়লার থেকে বিরত থাকছি সে ভয়ের কারন তো ঐসব মুরগীতেও বিদ্যমান। এভাবেই ব্রয়লারের পরাজয় ঘটে। খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলতে থাকে ব্রয়লার ও ক্ষুদ্র খামারী। নিরপরাধ ব্রয়লার আজ আসামীর কাঠগড়ায়। অথচ কি না দিয়েছে আর কতকি দিতে পারত। এক সময় বেকারত্ব দূর করেছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা দিয়েছে। কর্ম সংস্থান করেছে। দেশী মুরগীর তুলনায় ২৪ গুণ বেশি মাংস দিয়েছে। গরীব মানুষ প্রাণিজ আমিষ খেতে পেয়েছে।

বাঙ্গালি নেতিবাচক না হলে আজ দোকানে দোকানে মুরগী আর মুরগীর মাংসের হরেক রকম খাবার থাকত। বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারতাম আমরা। বাঙ্গালি নেতিবাচক মানসিকতার কারণেই আজ দেশী মুরগীর তুলনায় ২৪ গুণ বেশি উৎপাদনশীল ব্রয়লার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। বেশি বঞ্চিত হচ্ছে গরীব মানুষ। অর্থনীতির ভাষায় পোল্ট্রী শিল্পের এই পরিস্থিতি গরীবের দুষ্ট চক্রের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরন। গরীবরা স্বভাবগত কারনেই গরীব থাকে এবং গরীব থাকার কারণে সহজেই কিছু কারণ গরীব থাকার জন্য প্রভাবিত করে। তাই নীতি নির্ধারণীতে যারা রয়েছেন এসকল বিষয় বিবেচনা করে তাদের একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে আবারও চেষ্টা করি কিভাবে ব্রয়লার উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গড়ে তুলি।

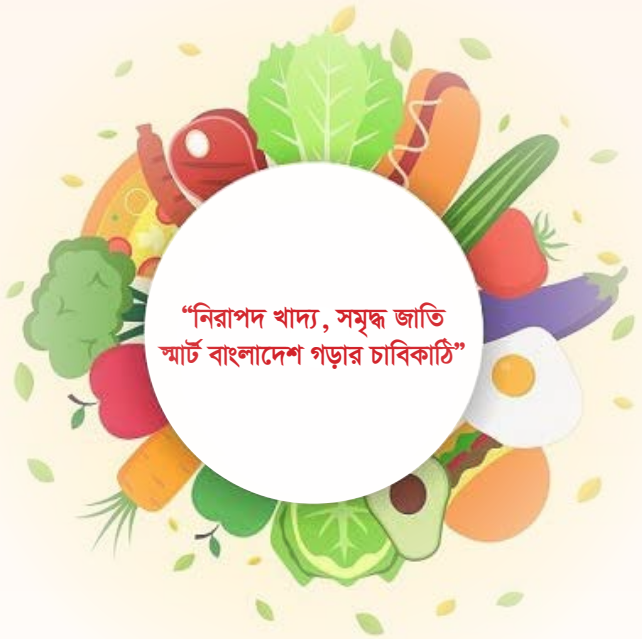

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা: প্রেক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. এ. কে. ওবাদুল হক
ফুড টেকনোলজি এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স বিভাগ
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ আমরা সুখি ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি। পাশাপাশি এখন আরও উন্নত সমৃদ্ধশলী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং তা অদূর ভবিষ্যতে অর্জনও করবো ইনশাআল্লাহ।

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি, ইউক্রেন-রাশিরা যুদ্ধ, কোভিড-১৯ মহামারী এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল আবারও ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য জর্জরিত হচ্ছে। তবে আশার কথা হলো এত কিছুর প্রভাবের পরও আমাদের সোনার বাংলা আজও বৈশ্বিক চালেঞ্জ মোকাবিলায় সফল। সফল কারণ হলো বর্তমান সরকারের যথাযথ পর্যবেক্ষণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে স্বাগত জানানোর প্রয়াস।

অতএব, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এখন আমাদেরকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের এক বিশাল চালেঞ্জ জয় করতে হবে। শিল্প বিপ্লব হলো এমন একটি আধুনিক সু-ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ শাখা/ধারার ব্যপক উন্নয়নের অথবা প্রয়োগের ফলে সারা পৃথিবীতে সনাতন ধারণা থেকে আধুনিকতার উত্তরণ ঘটে এবং যার ধনাত্মক প্রভাব কয়েক দশক পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমাদের এই পৃথিবীত এখন পর্যন্ত ৩টি শিল্প বিপ্লব ঘটে গিয়েছে এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে আমরা আমাদের কাজে লাগানো সুযোগ পেয়েছি। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ এখনও ৪র্থ শিপ্লবকে নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই, আমাদের এখন পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব হলো রোবটিক্স, আইওটি, ন্যানো প্রযুক্তির সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এক বহুমাত্রিক মেলবন্ধন যেখানে শরীরবৃত্তিয়, জৈবপ্রযুক্তি, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডেটা শেয়ারিং এবং প্রয়োগের মাধ্যমে মানব কল্যাণ করা যায়।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে চরম খাদ্য সংকটে পতিত হলেও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তির পূর্বেই বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় সয়ংসপূর্ন হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য উৎপদনে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের একটি হয়েছে, যা মূলত ৩য় শিল্প বিপ্লবের সঠিক প্রয়োগের ফলাফল এবং কৃষির কতিপয় ক্ষেত্রে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনার ফসল।

উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধির ফলো মানুষের খাদ্যাভাসের ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, বেড়েছে খাদ্য গ্রহণের বৈচিত্রতা। তবে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো- আমাদের উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীর নিরাপদতা (সেইফটি) যা নিয়ে এখনও জনমনে সংশয় রয়েছে। রয়েছে কতিপয় দুষ্কৃতিকারীদের খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা, খাদ্য বিষক্রিয়া, সংক্রমণ ও সুযোগসন্ধানীদের খাদ্য উচ্চ মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা। আর এই প্রবণতা থেকে সুস্থ, সবল জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। বিগত দশকে বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন প্রনয়নে মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে যাদের কাছে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তার গুরু দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের মূলনীতিগুলোকে এখন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-আধুনিক ল্যাবরেটরিতে রোবটিক্স প্রযুক্তির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেন্সর ব্যবহার করে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসারের দিকে দিক নির্দেশনা দিতে পারে। খাদ্যের ভেজাল/ অপপুষ্টি শনাক্তকরণের বিভিন্ন ধরনের বায়োসেন্সর অথবা ন্যানো টেকনোলজির কৌশলকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও স্মার্ট ডিভাইস, সিনথেটিক বায়োলজি, নবায়নযোগ্য

খাদ্য প্রযুক্তি, কৃষিজ উৎপাদন থেকে ভোক্তার খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্য পৌছানোর প্রতিটি ধাপের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং ব্যবস্থাপনা করলে খাদ্য ঝুঁকির নিরাপত্তায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ফলেই খাদ্য ব্যবস্থাপনায় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে আমরা বহুদূর এগিয়ে যেতে পারি।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো- দক্ষ জনশক্তি, ভৌত অবকাঠামো এবং সঠিক পরিকল্পনা। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্রয়োজনীয় আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে যা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নিরাপদ খাদ্য পরিচালনা/ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত ভাবে কতটুকু স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পিছিয়ে রয়েছে তা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করে, প্রযুক্তির সাথে দ্রুত অভিযোজন ঘটিয়ে যথোপযুক্ত প্রয়োগ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি অর্জিত লক্ষ্যসমূহ সার্বজনীন গ্রাহ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারি ও সময়োপযুগী পদক্ষেপ। এই ধারাবাহিকতার ফলেই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে উন্নত জাতি গঠন তথা " স্মার্ট বাংলাদেশ" গঠন সম্ভবপর হবে বলে আশা রাখি।

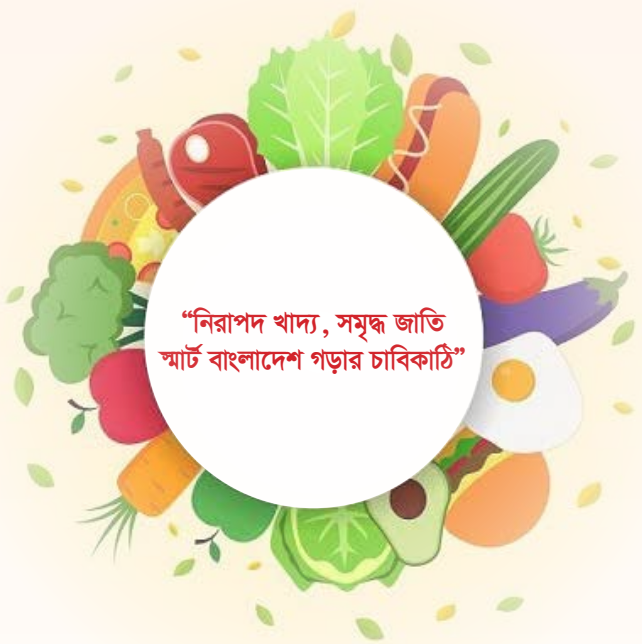

INDISCRIMINATE USE OF HARMFUL CHEMICALS IN FRUITS AND THEIR EFFECTS ON HUMAN HEALTH

Dr. M. A. Rahim
Professor (Rtd.), Dept. of Horticulture
Faculty of Agriculture, Bangladesh Agricultural University

ABSTRACT

Fruits are highly nutritious and form a key food commodity in human consumption. They are highly perishable due to their low shelf life. These food commodities are reported to be contaminated with toxic and health hazardous chemicals. Chemicals like calcium carbide, higher doses of ethylene are reportedly being used in fruit for artificial ripening of fruits and for increasing the size of fruits etc. Moreover, formalin is also used for extending the shelf life of fruits which causes several health problems. Calcium carbide more commonly known as 'Masala' is a carcinogenic agent and banned under PFA Rules. Recently Bangladeshi peoples are consuming toxic fruits which are ripened by a hazardous chemical, mainly calcium carbide. This poses great health risks to consumers. Calcium carbide has cancer-causing properties and causing neurological disorders, it can result in tingling sensation and peripheral neuropathy. A significant number of pregnant women consume fruit ripened with carbide, resulting in children born with abnormalities. In **India** the use of calcium carbide to induce ripening is banned under the Prevention of Food Adulteration Act, and offenders are

Moreover, the widespread use of formalin in preservation of fruit and vegetables is posing a threat to public health. The chemical used as a solution in water makes fruits attractive and colorful. Use of non-edible coloring materials and toxic coating materials in fruits for extending shelf life and attractiveness also causes serious health hazard in Bangladesh. Apart from these chemicals out farmers are using large amount of pesticides for production of fruits and vegetables. This paper is mainly focuses on the indiscriminate use of chemicals and their effects on health hazard.. Moreover, research results conducted by my MS, PhD students here in BAU also addressed e.g. how to produce attractive, chemical free safe fruits for the consumers. Use of edible coating like Chitosan, Aloe Vera gel, non-chemical ripening processes, non-chemical process of extending shelf life of different fruits has also been suggested. Consumer's awareness for these toxic chemicals also suggested. However, from my study under the project AVC – USAID found that our farmers are not using calcium carbide which was used in the past. But sometimes, our farmers as well as traders used ethylene for enhancing ripening and for color development of fruits. The ethylene is not toxic if used concentration of upto 200ppm (Ref. Rule 44-AA of the PFA Prevention of food Adulterating Rules, 1955).

Keywords: Fruits, chemical, calcium carbide, formalin, indiscriminate use, pesticides, health hazard, food safety,

RESULTS

A.1 Indiscriminate use of Calcium Carbide:

Recently in Asian countries peoples are consuming toxic fruits which are ripened by a hazardous chemical, calcium carbide. This poses great health risks to consumers.

Calcium carbide has cancer-causing properties and is capable of causing neurological disorders.

A.2. Indiscriminate use of Formalin

Formalin is a colorless strong-smelling chemical substance usually used in industry of textiles, plastics, papers, paint, construction, and well known to preserve human corpse. It is derived from formaldehyde gas dissolved in water. The widespread use of formalin, in preservation of fish, fruit and other food items is posing a threat to public health. The chemical used as a solution in water keeps fish fresh and makes fruits like mangoes attractive. This chemical, usually used to stop dead bodies from rotting, is now being used to preserve edible items. Exposure from its gas or vapor can cause irritation to the eyes, nose and respiratory tract, causing sneezing, sore throat, larynx constriction, bronchitis and pneumonia. Multiple exposures can lead to asthma.

A.3. Use of Ethrel /Ethylene /Ethephon

- Excess ethrel are used to artificially ripen fruits. AS per PFA up to 100ppm ethylene is permissible, but condition that its must be applied on physiologically mature fruits.
- The other popular method is to ripen fruits specially bananas through heating in a closed environment lead to poor quality
- Ministry of Agriculture (USA, India, Canada and others) has clarified that the fruits are exposed to ethylene gas (fruit ripening plant hormone) in low concentration of 10-100 ppm exogenously to trigger their ripening. It is considered safe in the concentration varying from 0.001-0.01% depending upon the crop, variety and maturity (USDA -ARS). There is no specific provision in PFA for ripening agents.

A.4. Coloring materials

- Dyes: Eating foods containing industrial dyes and colours causes violent allergic reactions, respiratory problems, asthma, liver disorders and kidney dysfunction and bone marrow disorders. Nowadays, coal tar dyes are being used in sweetmeats.
- Asthma Caused by toxic dyes used in most of the fruits
- The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is now warning the public not to consume the Heritage brand Palm Oil which contain a non-permitted colour. This cause cancer in laboratory animals and also be significant for human health specially mental disorder, headache, allergy etc.

A.5. Coating materials

- As per rule 48-E of the PFA Rules. 1955 fresh fruits and vegetables shall be free from rotting and also from coating of waxes, mineral oils and colours.
- However, there is provision for coating fruits with food additive viz. bee wax (white/yellow) carnauba wax or shellac wax as glazing agent is accordance with the Good Manufacturing Practice for use of food additive under proper label declaration as defined in sub-rule (ZZZ) of Rule 42.
- Recently we are using Chitosun and Aloe vera gel which are edible coating materials and safe from health hazards.

A.6. Other contaminants their source in Fruit and vegetables and ill health effects?

Pesticide residues, crop contaminants (aflatoxins, patulin, ochratoxin, etc.) naturally occurring toxic substances and heavy metals are the major contaminants found in fruit and vegetables. Pesticides are used in management of pests and diseases in Agricultural and Horticultural crops. Heavy metals are present in the irrigation water and other manures. Infested seeds, irrigation water and soil act as the source of the fungal toxins. Pesticides can leave

adverse effects on the nervous system. Some harmful pesticides can cause several hazardous diseases like cancer, liver, kidney, and lung damage. Certain pesticides can also cause loss of weight and appetite, irritability, insomnia, behavioral disorder and dermatological problems. The pesticide residue found in fruit and vegetables include residues of both banned (Aldrin, Chlordane, Endrin, Heptachlor, Ethyl Paration, etc.) and restricted pesticides for use in India/Bangladesh (DDT, Endosulfan, etc.). Heavy metals also cause adverse effect in human metabolic system, skin diseases, heart problems, etc.

B. What are the residue limits of different chemicals?

- Bee wax (white and yellow) or carnauba wax or shellac wax are permitted to be used in accordance with the Good Manufacturing Practice for use of food additives.
- Since use of carbide gas is prohibited in ripening of fruits under PFA, no tolerance limit for its residue is permitted.
- No tolerance limit for colour and mineral oil on fruits and vegetables has been allowed.
- The Maximum Residual Limit (MRL) of pesticide residues are given under PFA Rules, 1955 (Rule 65).
- The presence of heavy metal in the food item (fruit and vegetables) shall not exceed the value given under PFA Rules, 1955 (Rule 57).
- The presence of crop contaminants and naturally occurring toxic substances in fruit and vegetables shall not exceed the maximum limit prescribed under PFA Rules, 1955 (Rule 57A and 57B)

C. Advice to Consumer:-

- Select fruits and vegetable without spots or necrosis (lesions) and any abnormality.
- Wash fruits and vegetables thoroughly with water (preferably) running potable water before eating and cooking.
- Purchase fruits and vegetables from known dealers.
- Peeling of fruits before consumption and vegetables before cooking will reduce exposure to pesticide.
- Do not buy and consume cut fruits from open market.
- Throw away fruits and vegetables infected by mold/fungus.
- To minimize the hazards of pesticide residues, discard the outer leaves of leafy vegetables such as lettuce and cabbage.
- Do not wash fruits and vegetables with detergents as they may get absorbed inside.
- Ensure the quality of fruits and vegetables by sending them to voluntary testing laboratories.
- Wash your hands with soap and potable water, use clean utensil and clean cutting board with stainless steel knives
- Do not choose fruits that are attractive on the outside as they may not be good for health. Fruits that have a uniform colour, for example, a bunch of bananas having a uniform colour, are more likely to have been artificially ripened.
- Wash the fruits thoroughly before consuming. Keep them under running water for a few minutes, so that the chemicals are washed away.
- Do not buy fruits sold during their off season, as they are more likely to be artificially ripened.
- While eating mangoes and papayas, always remove the peel before cutting fruits into pieces.

D. Some recommendations for Action Plan for food safety

- Review of laws/infrastructure/coordinating mechanism and provide technical assistance to update those towards regional harmonization.
- Review of standards and certification systems in purview of international requirements.
- Review of research and study program and help conducting research and study projects.
- Technical assistance in 10 years' training/awareness building program.
- Assist in developing risk analysis infrastructure and making risk limits for adulterants/contaminants.
- Provide support for publishing a regional food safety bulletin containing news and views on food safety data/events/information/development.
- Assist in establishing food safety cell or commission or council at the SAARC secretariat.
- All of the Asian countries should prioritize their efforts in establishing and evaluating priorities in food borne disease prevention & control.
- Establish a Regional epidemiological network among the SAARC countries on all possible ways to combat FB-disease outbreaks, particularly the possible risks of being contaminated with a used range of FB-diseases in all countries of SAARC.
- Chalk out long term & sustainable resources, means & ways to fight back FB-illnesses from respective countries.

References

1. Rahim, M. A., M. S. Alam, and M. M. Anwar.2012. Annual Report. FTIP-BAU-GPC. BAU, Mymensingh 200pp
2. Rahim, M. A., A.K. M. A. Alam, M. S. Alam and M. M. Anwar..2011. Underutilized
3. Fruits in Bangladesh. BAU, Bioversity International, RDA-Korea. 205pp.
4. Rahim, M. A. 2021. Annual Report, FTIP-BAU-GPC. 110pp
5. Rahim, M. A. and J. A. Jokhio. 2014. Effect of pre- and post-harvest factors affecting quality and shelf life of mango. Part of PhD thesis, BAU, Mymensingh
6. Government of Bangladesh: Various documents.
7. MOA (2004): Report of the National Task Force on Food Safety Bangladesh for FAO-WHO Regional Conference on Food Safety for Asia and the Pacific Seremban, Malaysia, 24-27 May 2004.
8. MOF (2004): Report of the Working groups for Harmonization of food safety laws, regulations, control system, control mechanism and standards for facilitating food trade among the SAARC countries.
9. Rouf, Abdur Md. (2004): Enhancing Certification System for Better Marketing, Country paper prepared for APO Seminar to be held in Tokyo, Japan, January 2004
10. Zahangir, Alam Md. (2002): Sanitary and Phytosanitary Measures, Bangladesh Country Paper presented in APO Seminar, Tokyo, Japan.

NANOPARTICLES AS AN ALTERNATIVE TO ANTIBIOTICS

Professor Md. Abdul Kafi and
Aminur Rahman
Department of Microbiology and Hygiene
Bangladesh Agricultural University

Antimicrobial residues in food of animal origin have recently been considered as a threat for public health because of indiscriminate use of antibiotics in the livestock sector. Such residues often confer Antimicrobial Resistance (AMR) to the bacterial population circulating in the environment. Consequently, global health threat is increasing with the increasing livestock production for mitigating huge demands of the growing populations across the Globe1. Recently, this scenario has been worsen due to the industrialized expansion of those sectors (Livestock, poultry farming and aquaculture)2. Such commercial farmers are frequently using antimicrobials to their farming without considering their spillage in foods and environments3. Residue of those irrationally used antimicrobials in farm products are responsible for conferring resistance microflora to the environment4. This environmental exposure of resistant microflora confers AMR to other cohabitate microflora through there plasmid sharing. Consequently, majority of available antimicrobials are failed to resist subsequent infection to consumers5. For instance, penicillin, generation of cephalosporin (1st & 2nd), generation of quinolones (1st, 2nd, 3rd), Sulphonamide are 100% resistant, aminoglycosides, tetracyclines are 50% resistant, while 3rd generation cephalosporin and 4th generation quinolones are 30% resistance, and other broad spectrum antibiotics are 20% resistance6. As a result, we are now depended on 4th generation Cephalosporin's, Tigecycline, Aztreonam, Colistin, Carbapenem, Teicoplanin, Voriconazole, and Amphotericin B etc7. If this continue, the situation would arise when patient would have died of with ordinary septicemia. Therefore, exploration of new antimicrobial agents is appropriate approach as a preparedness for the forth coming post-antibiotic era. The development of high functional antimicrobial nanomaterials could be an ideal approach for such purpose. Nanotechnology has already been used for a wide range of applications in biology8 and medicine9 because of its promising role on the low input-maximum outputs (Figure 1) based farming system and eventually been recognized as a potential tool for achieving Sustainable Development Goals (SDGs). The principle of this promising technology lies on its- i) enhanced functionality through increasing surface area, ii) precise selectivity through target specific action for avoiding unwanted exposure and iii) decreasing environmental spillage of drugs, toxicants, insecticides, pesticides etc. through decreasing doses.

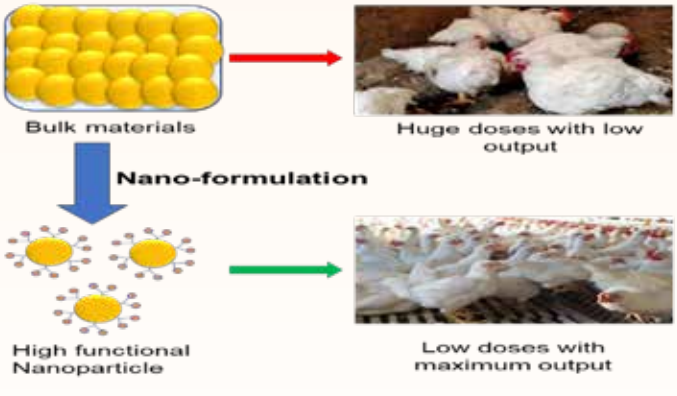

Figure 1. Schematic illustration of role of nanotechnology in low-input but maximum-output based farming

In Bangladesh, many organic, inorganic and their hybrid Nanoparticles (NPs) have already been employed as antimicrobial agents in various commercial household products, such as- disinfectants, sanitizers, antibacterial coatings of equipment's (Freezer, air conditioner, washing machine etc.), cosmetics10 etc. However, their applications as nanotherapeutic have not been explored yet. Recently, antimicrobial effects of many NPs have been tested against circulating multidrug resistance bacteria as well as virus and fungus of various environmental settings at home and abroad11. Based on the success of those studies, such nanoparticles are considered as an alternative to commonly practiced antibiotics against circulating bacteria of various environmental settings. Hence, use of those NPs as nanotherapeutic could be an effective approach for minimizing use of traditional antimicrobials12. However, such promising application is largely depended on the fabrication strategies, functionality and biocompatibility of available NPs. Therefore, bionanomaterials with adequate antimicrobial activity, bioresorbability and biocompatibility are the materials of choice for minimizing the AMR as well as for offering antimicrobial residue free safe foods for consumers. Considering the précised size and characteristics surface features, the nanotechnology-driven approach has been employed for synthesizing nanoparticles to selectively target and destroy not only pathogenic bacteria but also fungus and virus 13. Various nanoparticles have already been proven as potential antimicrobials and drug delivery systems, like- AgNPs, Chi-NPs, polymer micelles, nanocapsule, Nano gels, Nano liposomes, Dendrimers etc14. Examples of such applications include- NPs as antibacterial coatings for implantable devices, antimicrobial materials to prevent biofilm formation, drug delivery systems and as wound healing materials.

Nanomaterials (NM) interact electrostatically with the bacterial membrane causing membrane disruption15. Some report stated that frequently, free radicals (ROS yellow spots) are produced due to the NM-membrane interactions as shown in Figure-2. These free-radicals may instigate secondary membrane damage, hinder protein function, cause DNA destruction, and result in excess free radical production. According to other reports antibacterial NM showed photo activated (photocatalism) mechanism of bacterial cell damage. Some NM induces apoptosis signal for promoting programmed cell death. Unlike antibiotic, such mechanism of action of a NM cannot be prevented by resistance phenomenon of bacteria.

Nanomaterials (NM) interact electrostatically with the bacterial membrane causing membrane disruption[15]. Some report stated that frequently, free radicals (ROS yellow spots) are produced due to the NM-membrane interactions as shown in Figure-2. These free-radicals may instigate secondary membrane damage, hinder protein function, cause DNA destruction, and result in excess free radical production. According to other reports antibacterial NM showed photo activated (photocatalism) mechanism of bacterial cell damage. Some NM induces apoptosis signal for promoting programmed cell death. Unlike antibiotic, such mechanism of action of a NM cannot be prevented by resistance phenomenon of bacteria.

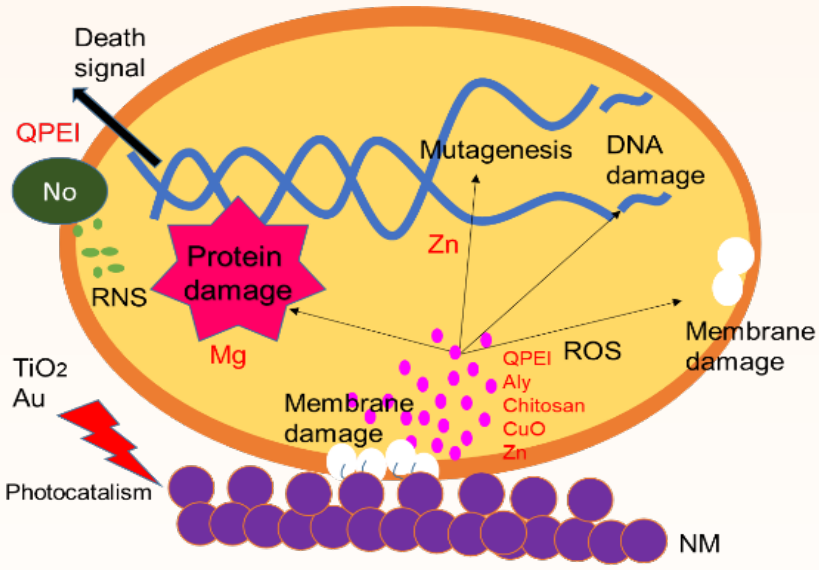

Figure 2. The schematically illustrated mode of action of Nanomaterials (NM) as alternative of antibacterial

Owing to their small sizes and higher surface-to-volume ratio, NM offer huge contact area with a microorganism. Due to this feature, NM possess enhanced biological, chemical and physical activity, and therefore, antimicrobial nanoparticles offer higher antibacterial activity. Another important property of NM is their ability to target multiple bacterial structures, such as- disruption of cell membranes, increases permeability, protein/DNA damage. Specifically, upon penetrating into bacterial cell, nanoparticles can disturb the functions of Sulphur-containing proteins and phosphorus-containing compounds, such as- DNA. In the recent year, many nanoparticles have been utilized as alternative of antimicrobial/antibacterial drugs as an innovative alternative that enhances therapeutic effectiveness and minimizes the undesirable side effects of drugs.

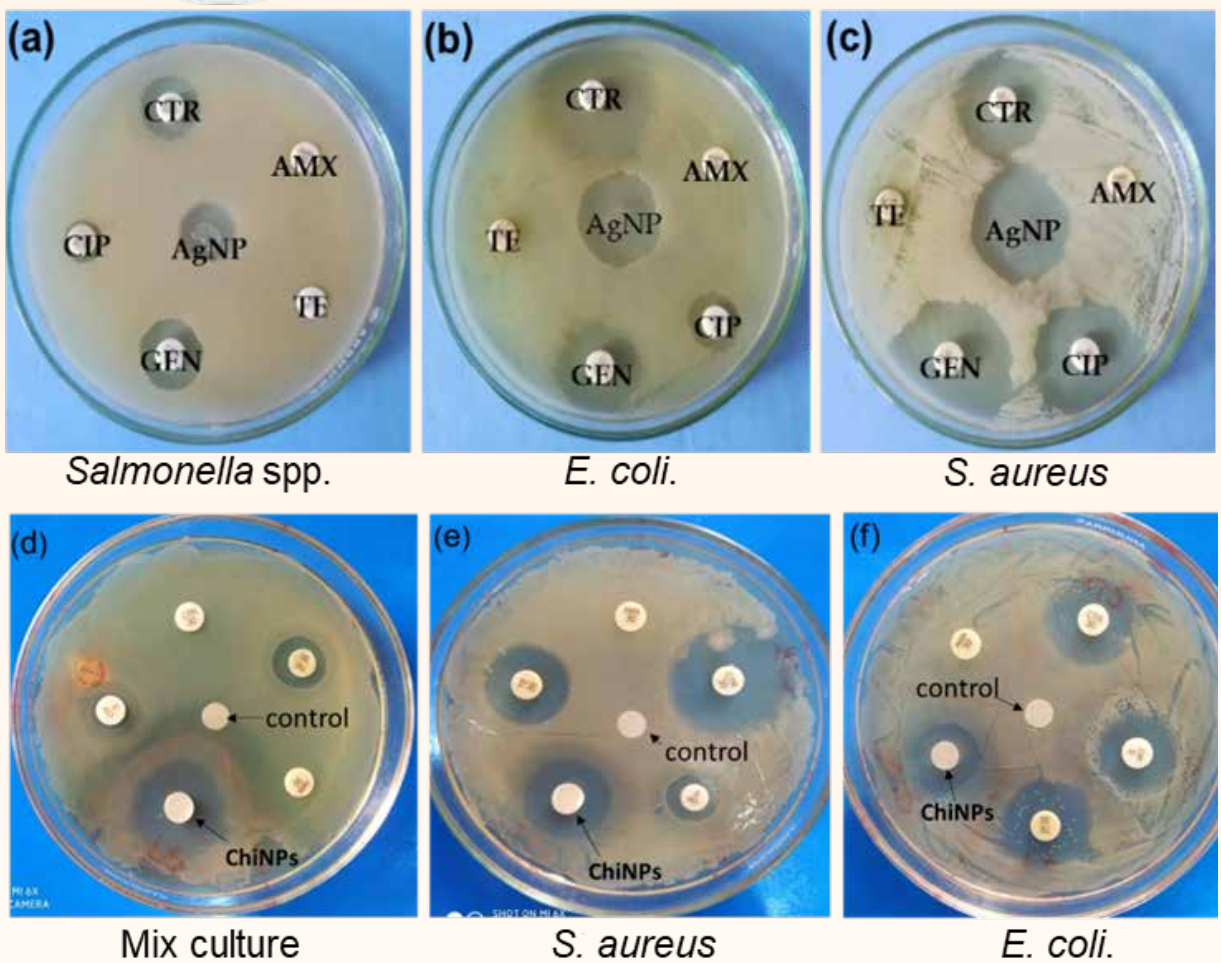

Figure 3. Anti-bacterial effects of Silver Nanoparticles against, a) *Salmonella spp.,* b) *E coli*, c) *Staphylococcus aureus* and Chitosan Nanoparticles against d) mixed culture*,* e) *Staphylococcus spp.,* and f) *E coli*

A recent antibacterial investigation using Silver Nanoparticles (AgNPs) and Chitosan Nanoparticles (ChiNPs) showed excellent performances against bacteria from live birds (Figure 3). For this, the antibiogram profiling was employed using standard disk diffusion method where the zone of inhibition surrounding the disk used as a parameter for evaluating the sensitivity of AgNPs against *Salmonella* spp., *E. coli* , and *S. aureus* in comparison with commercial antibiotic disk (Figure-3a-c). AgNPs having positively charged surface, ligand replacement ability and oxidative dissolution capabilities facilitate their binding to the negatively charged surface of bacteria and result enhanced bactericidal effect[15]. The antibacterial effectivity of ChiNPs was also studied in parallel with commercial antibiotic disks where, ChiNPs found effective against *S. aureus*) and *E. coli* separately as well as against their mixed culture (Figure3d-f), while commercial antibiotic disks were found ineffective against mixed culture.

References

1. Jamison, D. T. *Disease Control Priorities, 3rd edition: improving health and reducing poverty*. *The Lancet* vol. 391 (2018).
2. Thornton, P. K. Livestock production: Recent trends, future prospects. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* **365**, 2853–2867 (2010).
3. Khatun, R. *et al.* Validation of the Declared Withdrawal Periods of Antibiotics. *Univers. J. Public Heal.* **6**, 14–22 (2018).
4. Manyi-Loh, C., Mamphweli, S., Meyer, E. & Okoh, A. *Antibiotic use in agriculture and its consequential resistance in environmental sources: Potential public health implications*. *Molecules* vol. 23 (2018).
5. Nhung, N. T., Chansiripornchai, N. & Carrique-Mas, J. J. Antimicrobial resistance in bacterial poultry pathogens: A review. *Front. Vet. Sci.* **4**, 1–17 (2017).
6. Spicer, T. P. *Drug Discovery Targeting COVID-19*. *SLAS Discovery* vol. 25 (2020).
7. Zembower, T. R. *Infectious Complications in Cancer Patients*. vol. 161 (2014).
8. Roy, K. J., Rahman, A., Hossain, K. & Rahman, B. Antibacterial Investigation of Silver Nanoparticle against Staphylococcus, E. coli and Salmonella Isolated from Selected Live Bird Markets. *Appl. Microbiol. Open Access* **6**, 173 (2020).
9. Wang, L., Hu, C. & Shao, L. The-antimicrobial-activity-of-nanoparticles--present-situati. *Int. J. Nanomedicine* **12**, 1227–1249 (2017).
10. Kafi, M. A., Paul, A., Vilouras, A., Hosseini, E. S. & Dahiya, R. S. Chitosan-Graphene Oxide-Based Ultra-Thin and Flexible Sensor for Diabetic Wound Monitoring. *IEEE Sens. J.* **20**, 6794–6801 (2020).
11. Gao, W. & Zhang, L. Nanomaterials arising amid antibiotic resistance. *Nat. Rev. Microbiol.* **19**, 5–6 (2021).
12. Allahverdiyev, A. M., Kon, K. V., Abamor, E. S., Bagirova, M. & Rafailovich, M. Coping with antibiotic resistance: Combining nanoparticles with antibiotics and other antimicrobial agents. *Expert Rev. Anti. Infect. Ther.* **9**, 1035–1052 (2011).
13. Tang, L. *et al.* Nanoparticle-mediated targeted drug delivery to remodel tumor microenvironment for cancer therapy. *Int. J. Nanomedicine* **16**, 5811–5829 (2021).
14. Rosen, Y. & Gurman, P. Carbon nanotubes for drug delivery applications. *Nanotechnol. Drug Deliv. Vol. 1 Nanoplatforms Drug Deliv.* 233–248 (2014) doi:10.1201/b17271.
15. Le Ouay, B. & Stellacci, F. Antibacterial activity of silver nanoparticles: A surface science insight. *Nano Today* **10**, 339–354 (2015).

IMPORTANCE OF QUALITY CONTROL LABORATORIES (QCLS) AND PRESENT CONDITION OF SOME QCLS. IN FOOD AND AGRICULTURAL SECTOR OF BANGLADESH

Mohammed Ariful Islam
Professor
Department of Agricultural Chemistry

QLCs and their importance

Bangladesh is one of the most densely populated country in the world. It is therefore important to have a profitable, sustainable and environment-friendly agricultural system in order to ensure long-term food security for people. The agriculture sectors have been given the highest priority by the Govt. and as a result Bangladesh has already achieved self-sufficiency in major food crop production. Nevertheless, the food safety issues still needs more development where quality control laboratories (QCLs) play a crucial role in testing and verifying finished product. QCLs help continuously to meet the national and international standards of product quality and their safety. They also alert regulators, procurers and manufacturers of the need for corrective action when necessary. If someone likes to export any agricultural products from Bangladesh, need the QCL certificates of different parameters according to the demand of the importing country. The exported product may be rejected or may get export band due to the lack of quality assurance. On the other hand, low quality and hazardous product may enter our country and might adversely affect public health if the Bangladesh port authority does not have sufficient capacity to test properly the imported products. QCLs follow standard processes, operations and authorized protocols to ensure the accuracy and reproducibility of their results. In addition, the quality control measures developed in a QCL are the building blocks for the process of certification and accreditation. Therefore, results obtained from such laboratories give confidence during any international trade and promote economic gain by satisfying the consumer demands appropriately.

QCLs in the food and agricultural sector of Bangladesh

According to the Bangladesh Accreditation Board (BAB) (http://www.bab.gov.bd assessed in 7th January, 2023), currently we have 70 testing and 14 calibration accredited laboratories. There is no accredited sampling laboratory (the accredited sampling laboratories have to collect sample using a standard protocol and skilled personnel to avoid any deterioration of collected samples during collection and transportation. Proper sampling have significant influence on the analytical results). Out of these 70 accredited testing laboratories, currently BAB suspended the certificates of 8 laboratories. The remaining 62 running accredited laboratories, only 14 QCLs directly deals with the agricultural and food or feed products (9 Govt. and 5 private). However, none of the QCLs able to provide a complete range of analytical service. Moreover, some private QCLs developed to meet their own products requirements and not open for outside samples (such as QCLs of Nestle, Pran and Lal Teer Company). Many of the QCLs have only few or even only one accredited method. For example, according to the BAB website, Pesticide Analytical Laboratory of Entomology Division of BARI has only one accredited method. Although it does not mean that this lab. is not able to do the other pesticide analysis properly but still they are not BAB certified. The most established field in the agriculture sector is Fisheries sector. They have three QCLs with wide range of accredited test facilities. But they also have limitations. These fisheries QCLs are mainly focus on the quality control of exported shrimp but not that much of the internal local markets. The most developed QCL in the Govt. level for the agricultural products is probably the newly developed Department of Livestock Services lab. at Savar. This lab. currently have 18 accredited method to support the major needs in this sector. Unfortunately Plant Quarantine Wing (PQW) of Department of Agricultural Extension (DAE) still does not have any QCL. This important wing is involved in the ports (all land ports, seaports

and airports) to regulate the export-import of plants or plant products, pests, beneficial organisms and packing material according to the phytosanitary requirements in consistence with international agreements. Lack of QCLs in this department might open the door to enter low quality agricultural inputs such as seed, fertilizers and pesticides in the country. According to a report by USDA, only the Chittagong port services 79% of Bangladesh's agricultural imports and exports. But the laboratory facility of the plant quarantine division of Chittagong port is very poor and inadequate. Therefore, this sector needs a quick development. According to my information, a process is under implementation by Govt. to establish a QCL for the department. As soon as it start working is good for the growing agriculture sector.

Major problems related to the sustainability of the existing Govt. QCLs

It is clear from the above that currently the agricultural sector has only few QCLs and clearly there is demand for more such lab. in Govt. sector. Therefore, it is very important that the existing Govt. QCLs should work properly until some new are included. According to my observation, there are three major issues in relation to the sustainability and proper service of the existing Govt. QCLs in the agricultural sectors. Firstly, the available funding for the regular maintenance of the sophisticated machines and training of the scientists. Even if the machine is not used of testing samples regularly, it needs regular maintenance to keep it active. Especially the QCLs which are located outside Dhaka are difficult for proper maintenance and sometimes it is neglected by the authority due to the cost involvement. Secondly, the lack permanent officers. Usually the officers get posting in the lab. for few years and when they are trained up transferred to a non-relevant position after having promotion. Thirdly, lack of giving incentive in QCLs. As it is very difficult to maintain 9-5 office times for the personnel involved in the analysis, there should be a way of giving them incentive. In most of the cases, the scientist need huge extra time to analyze and deliver results on time. For example, recently I have visited the DLS and DoF QCLs at Savar, where instead of staying Dhaka with their family, a considerable number of scientist stay in the dormitory or very nearby areas due to the workload.

Conclusion

Over the last century, the amount of food traded internationally has grown exponentially. Hence, together with the other food safety measures, QCLs are essential tools to maintain the quality and to ensure the safety of the products which are imported or need to export. It is true that maintaining a QC lab. is costly but it is nothing in compare to the huge economic loss when a product are recalled and if there is an export band from the imported country. The growing agricultural sector of the country need these laboratory facilities to ensure consumer safety and to maintain the competitive export market.

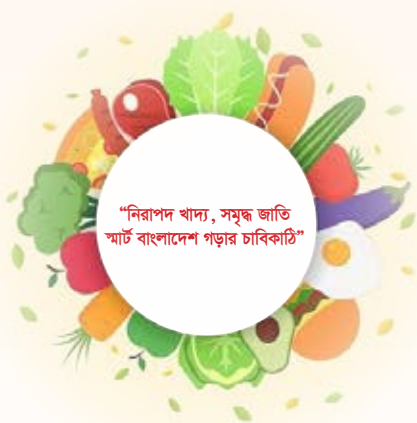

কাচ্চির সাথে বোরহানি খাবার আগে প্রশ্ন তুলুন!

প্রণব সাহা
প্রধান সম্পাদক, ডিবিসি টেলিভিশন

খাদ্যের নিরাপদতা বা ভেজালমুক্ত খাবারের বিষয়ে কথা বলতে গেলেই আমি একটা সামাজিক উদাহরণ দিই। বিয়ে বাড়ি বা যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের খাবারের টেবিলে আমরা সবাই বোতলজাত পানি খুঁজি। কারন টেপের জল বা জগে করে আনা কোনো পানিকেই এখন আমরা আর নিরাপদ বা জীবাণুমুক্ত পানি হিসেবে বিশ্বাস করতে পারিনা। হয়তো এটা আমাদের নাগরিক সচেতনতার বহি:প্রকাশ, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি বলি খাবার টেবিলে বোতলজাত পানি খেলেন,কিন্তু ঐ টেবিলেই সুস্বাদু কাচ্চি বা মোরগ পোলাওয়ের সাথে যে আপনি "স্বাদের বোরহান" পান করছেন সেটা কি বোতলজাত পানি দিয়ে তৈরী নাকি টেপের পানি দিয়ে ? কিভাবে নিশ্চিত হবেন ? হ্যাঁ এক্ষত্রে উদ্যোগী হতে হবে তাকেই ,যিনি আপনাকে বিয়ে,জন্মদিন বা খৎনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েছেন। আর আহ্লাদ করে বোরহানীর গ্লাসে চুমুক দেবার আগে আপনিও প্রশ্ন তুলুন। তা নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা পরিবারকে বিব্রত না করেই আপনি করতে পারেন। আর যদি সবাই এ ব্যাপারে সচেতন হই তাহলে এটাও কিন্তু খাদ্য নিরাপদতা বা ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাবারের জন্য আমরা যারা একটি নাগরিক আন্দোলন করার চেষ্টা করছি, তাদের জন্য বড় সমর্থন হবে। আর নিরাপদ থাকবেন আপনি,আপনার সন্তান আর আত্মীয়-স্বজনরা।

খাদ্যের নিরাপদতা বা নিরাপদ খাদ্য- এই ধারনাটা দেশে নতুন হলেও ভেজাল খাদ্য নিয়ে আমাদের উদ্বেগের শেষ নেই। আর সেই উদ্বেগও কিন্তু অনেক দিনের। আসলে ভেজাল খাবারও অনিরাপদ খাবার। আর যেটাকে আমরা অখাদ্য বা কুখাদ্য বলি , সেটাও অনিরাপদ খাবার। ফলে খাবারের নিরাপদতা নিয়ে আমাদের এখনকার কথা-বার্তা নতুন মনে হলেও আগের ভেজালমুক্ত খাবারের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টিই হচ্ছে নিরাপদ খাদ্যের আন্দোলন। আমিতো মনে করি নিরাপদ খাদ্যের আন্দোলনে শরিক হতে হবে সবাইকেই।

পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশে মানুষ গড়ে বছরে মাথাপিছু ১৭৩-১৭৫ কেজি চাল, ২৭-৩০ কেজি শাকসবজি এবং কম-বেশি পাঁচ কেজি মাংস খায়। এসব খাবার মাঠে চাষ বা খামারে উৎপাদন থেকে শুরু বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরন আর বাসায় এনে রান্না করে পাতে পরিবেশন করা পর্যন্ত যে কোনোভাবেই দূষিত হয়ে খাবার হিসেবে অনিরাপদ হয়ে পড়তে পারে! তাই নিরাপদ খাদ্যের আন্দোলনকারীরা বলছেন "প্লট থেকে প্লেট" সর্বত্রই সতর্ক থাকা দরকার খাবারের নিরাপদতা নিশ্চিত করবার জন্য। আর শুধু ভাত,সবজি বা মাছ-মাংসের বাইরেও একজন পুর্ণ বয়স্ক মানুষ বা শিশুরা প্রতিদিন আরো নানান রকম খাবার গ্রহন করি। বড়রা চা-কফি-স্নাকস, এমনকি ধুমপানও করেন। ছোটরা লজেন্স-বিস্কুট,আইসক্রিম আর প্রিয় চিকেনফ্রাই নিয়মিত খাচ্ছেন। এসব কিছুই যদি অনিরাপদ বা ভেজাল হয় তাহলে অসুখে পড়তে হবে, খরচ হবে চিকিৎসার জন্য আর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আমরা কি বড়দের চা-কফি খেতে না করবো, অবশ্যই না। তবে কেউ ধূমপান না করুক,সেটাই আমাদের চাওয়া। বাচ্চাদের কি লজেন্স-চকলেট এবং চিকেনফ্রাই না দিয়ে পারবেন, মা-বাবারা বলবেন "সম্ভব নয়" । তাহলে হয় এগুলো খুব কম খাওয়াতে হবে আর যা খাওয়ানো হবে সেগুলো যেন নিরাপদ বা ভেজালমুক্ত হয়। সবাই যদি নিজেরাই সচেতন হয়ে যায় তাহলে মোবাইল কোর্ট , নিরাপদ খাদ্য আদালত , এদের কাজ কমে যাবে।

গুণীজনরা বলেন " নিরাপদ খাবার খেলে ওষুধের প্রয়োজন হয় না। আবার খাদ্যের মান ও খাদ্যাভ্যাস না থাকলে ওষুধও কোনো কাজে আসে না।" তাহলে আমরা যতটা না দোষ দিবো ভেজাল খাবার উৎপাদনকারী অসৎ ব্যবসায়ীদের , তার থেকে বেশি সজাগ থাকবো নিজেরাই। আর সবাই মিলে যদি মোড়কজাত খাবারের গুণাগুণ নিয়ে প্রশ্ন তুলি, খাদ্য উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সতর্ক হবে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-'-এর আলোকে নানা বিধিমালা তৈরী করছে। এমনকি খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন কেমন হবে বা মোড়কে কি কি লিখতে হবে , তা নিয়েও রীতিমত কর্মশালা করে অভিজ্ঞজনদের মতামত নিয়ে এসব তৈরী হচ্ছে। তবে দেখতে হাবে ভোক্তারা এসব বিধির কথা জানে কি না ? আর যারা খাদ্যপন্য বাজারজাত করছে তারা যদি সেসব বিধিমালা না অনুসরণ

করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার মত শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে উঠছে কি না ? “জনবল সংকটের” উৎকট আপ্তবাক্য উচ্চারণের মানসিকতা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির আমলাতন্ত্রকে। মনে রাখতে হবে আমরা একুশ শতকের ডিজিটাল যুগে আছি । আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল নেয়ার জন্য নিজেদের তৈরী করছি। কিউ আর কোড দিয়ে আমরা এখন নানা বিল এবং জিনিসপত্রের দাম পরিশোধ করছি, তাহলে কেন মোড়কের গায়ের কিউআর কোড স্কান করে আমরা খাদ্য উৎপাদনের উপাদানগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হবো না? একটু ভিন্নভাবে বলি। খাদ্যে ভেজাল আছে কি না তা দেখবে শিল্পমন্ত্রণালয়ের বিএসটিআই, তাও তাদের আছে নির্দিষ্ট তালিকা। সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভাগুলোও কিছুটা হলেও এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি এইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মনোজগতেও পরিবর্তন আনা দরকার। তারা যে দেশের সকল মানুষকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন , তার জন্য তাদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া খুব জরুরী।

আমাদের দেশে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাবার না পাওয়ার অনেকগুলো কারণে মধ্যে একটি প্রধানতম কারন হচ্ছে ফসলে কীটনাশকের অপপ্রয়োগ এবং মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার। ফসল চাষে কীটনাশক ও সার দরকার হবেই কিন্তু তার মাত্রা এবং সঠিক প্রয়োগ না হলেই বিপদ। এক্ষেত্রে সারাদেশে তৃণমূলে যেসব কৃষি কর্মকর্তারা কাজ করেন তাদের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। এসব কৃষি কর্মকর্তারা যদি ফসল চাষে সঠিকমাত্রায় কীটনাশক ও সার প্রয়োগে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন,সেটাও কিন্তু নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনের একটি বড় সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে উপরে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ জাতির জন্য উপকারী হবে। আবার প্রক্রিয়াজাত করা নানা খাবারেও বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে খাদ্য,কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ এবং সমন্বিতভাবে কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। আসলে আমাদের দেশে খুব কম খাদ্যপণ্য আছে যেখানে ভেজাল নেই। মানুষ যে ভেজাল খাবার খেয়ে ধীরে ধীরে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন সেটা গবেষণা করে দেখাতে হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে। ফলে নিরাপদ খাদ্যের আন্দোলনে আমরা অবশ্যই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে পাশে চাই । কারন আমরা অসুস্থ হয়ে ডাক্তার,প্যাথলজি টেস্ট আর ওষুধের ওপর নির্ভর না হয়ে বিশুদ্ধ খাবার খেয়ে সুস্থ থাকতে চাই।

জাতীয় সংসদ ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন পাশ করেছে। আর সেই আইন বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালে ২ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে’ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ‘। ৬৪ জেলায় ও আটটি বিভাগীয় শহরে ৭৪টি নিরাপদ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভেজালবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁরা কাজ করছেন নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে। ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হলেও কমছে না ভেজালের ব্যাপকতা। অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদক্ষেপে আমাদের সমর্থন আছে। আবার এই আইন কার্যকর করতে গিয়ে নানারকম হয়রানির কথা বলেন ব্যবসায়ীরা। মনে রাখতে হবে যদি উৎপাদন পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করে, জনমনের আস্থা অর্জন করতে পারে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাহলে যে কোনো অন্যায়-হয়রানির বিরুদ্ধে মানুষই সোচ্চার হবে। তাই নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনে আমরা ব্যবসায়ী-দোকানদারদেরকেও পাশে চাই। কারন তাদের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদেরকেও তারা নিশ্চয় ভেজাল খাবার খাইয়ে অসুস্থ করতে চান না। এক্ষেত্রে নিজেরা উৎপাদক না হলেও সুপারশপগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা আস্থা আছে বলেই সুপারশপে যাই। কখনও একটু বেশি দামেই সেখান থেকে কেনাকাটা করি। তারা নিজেরা দাম বেশি না নিলেও, সুপারশপে কেনাকাটার জন্য ভ্যাট দিতে হয় যা খুচরো বাজারে প্রযোজ্য নয়। তাই আমরা চাই সুপারশপগুলো দায়িত্ব নিক যে তারা মেয়াদোত্তীর্ণ বা যে জিনিসটির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আস্থা রাখা যায় না তারা তা বিক্রি করবে না। আমরা ফল কিনতে চাই সুপারশপ থেকে,এই বিশ্বাসে যে সেখানে ফরমালিন দেয়া কোনো আম,আপেল,কমলা বা কলা নাই।

আর এই লেখাটা শেষ করতে চাই যারা রান্নাঘরে বেশি কাজ করেন,পরিবারের সকলের জন্য যিনি খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করেন তাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলে। হ্যাঁ অবশ্যই আমি জননী, জায়া আর ভগ্নিদের উদ্দেশ্যেই বলছি (ক্ষমা চেয়ে যে আমরা পুরুষরা তাদেরকে খাবার প্রস্তুতে খুব কম সহায়তা করি) । সবজি বা ফল কেটে কতটা পুষ্টিমান নষ্ট করি, বা খাবার কেটেকুটে ভেজে,ফ্রিজে রেখে বারবার বের করে গরম করে খাদ্যগুন নষ্ট হয় কি না সেটার দিকে একটু খেয়াল রাখুন। যে পানি বা তেল-মশলা ব্যবহার করছি তা খাদ্যকে অনিরাপদ করে তুলছে কি না , একবার ভাবুন। আর হ্যাঁ পরিবারের পুরুষরা শুধু খাবার খাবেন আর রান্না বা তার নিরাপদতা রক্ষায় রান্নার চুলায় বা খাবার পরিবেশনে কোনো সহায়তা করবেন না তাও যেন না হয়। সবাই মিলে সচেতন হয়ে নিজের খাবার নিরাপদ রাখি আর সবাই মিলে সুস্থ থাকি। এই হোক ঘরের স্লোগান, আমরা তা সভা-সেমিনারে মিছিলে মিটিংয়েও জোরের সাথে উচ্চারণ করতে চাই।

সুখাদ্য

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রধান সম্পাদক, গ্লোবাল টেলিভিশন

সুস্থ থাকবার জন্য বারবার শপথ নেয় মানুষ। প্রতিজ্ঞা করে অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিত্যাগ করবে। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কোনটি আর কোন খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাজ্য, তা নিয়ে ভোজনপ্রিয় বাঙালির ধন্দ যেন কাটতে চায় না। নিজের ঘরে যাওবা কিছুটা সচেতনতা থাকে, বাইরের খাবার নিয়ে লোভ ছাড়া আর কোন বিবেক কাজ করেনা।

শহরের ব্যস্তবহুল এলাকায় মিষ্টির দোকানের শোকেস ভর্তি লাড্ডু, জিলাপি, মণ্ডা-মিঠাই, সড়কে বিক্রি হওয়া পুরি, সিঙ্গারা, চপ, চটপটির রংচং দেখে চমক লাগে। মানুষ খায়, কিন্তু তাদের মনে প্রশ্ন জাগে না- এই খাবার কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর? কোন কৃত্রিম কি রং মেশানো রয়েছে? যদি প্রশ্ন জাগে তাহলে উত্তর জানার উপায়ই বা কী? প্রশ্ন জাগতে পারে হোটেলের তরকারি, মাংসের ঝোলের দেখেও। তেল কেমন? মশলাই বা কেমন?

এ তো গেল রাস্তা ও হোটেলের খাবারের কথা। বলতে গেলে সামগ্রিকভাবেই আমাদের খাদ্য সুখাদ্য কিনা সে নিয়ে বড় সন্দেহ রয়েছে। গণমাধ্যমে রিপোর্ট হয় -— আমরা কী খাচ্ছি? যা খাচ্ছি তা বিষ নয় তো? আমরা শুনতে পাই ফলমূলে কেমিকেল, মাছে ফরমালিন, মাংসে ক্ষতিকর হরমোন, শাকসবজিতে কীটনাশকের রেসিডিও।

খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে আমাদের উদ্বেগের শেষ নেই। কারণ সুস্থ-সবল, মেধা-মননশীল, প্রত্যয়দীপ্ত সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্য অপরিহার্য। যারা ক্ষতিকর রাসায়নিক, অনিরাপদ, অস্বাস্থ্যকর ভেজাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নিঃসন্দেহে তারা অনেক বড় অপরাধী। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, বাজারজাত করা ইত্যাদি থেকে শুরু করে যেকোনো স্তরে ক্ষতিকর জীবাণুযুক্ত, বিষাক্ত, দূষিত অনিরাপদ খাবার খেয়ে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি বাড়ছে স্বাস্থ্য ব্যয়ও।

তাই সরকারের নজর পড়েছে খাদ্য সুরক্ষায়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর এবার নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বড় ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও অন্তর্ভুক্ত ছিল বিষয়টি। আর তাই বিষয়টি সামনে চলে এসেছে জাতীয় ইস্যু হিসেবে। এই বাস্তবতায় নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর অধীনে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা এই কর্তৃপক্ষকে আমেরিকান খাদ্য এবং ড্রাগ প্রশাসন-এর মতো করে তৈরি করার একটা প্রচেষ্টা আছে আমরা শুনতে পাই। আইন ও বিধি সবই হয়েছে। এখন দেখার পালা এই কর্তৃপক্ষ তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী কতটা কাজ করতে পারছে, কতটা খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে রাজধানীসহ সারাদেশে হোটেল-রেস্তোরাঁর গ্রেডিং করার কাজ করেছে এবং এখনও করছে। এটি একটি খুবই প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু বাস্তবতা হলো পথের খাবার থেকে অভিজাত এলাকায় সক্রিয় দামী রেস্তোরাঁতেও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা নেই। সুনিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, রাজধানীর অমুক রেস্তোরাঁর খাবার ও পানীয় শতভাগ ভেজাল, জীবাণুমুক্ত এবং নিরাপদ। পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁ অবশ্যই আছে, তবে তাদের রান্না করা খাবার এবং পানীয় সর্বাংশে বিশুদ্ধ এমন নিশ্চয়তা মিলবে কিসের ভিত্তিতে, সেটা কোন গ্রেডিং দিয়েই নিশ্চিত করা যাবেনা।

আমাদের খাদ্যে ভেজাল পূর্ব দিকে সূর্য ওঠার মতো সত্যি। বলা যেতে পারে আমাদের খাদ্য সংস্কৃতিই কিছুটা এমন। মুখরোচক খাবারের প্রতি যতটা লোভ, স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি ততটা আগ্রহ নেই আমাদের। কারণ খাদ্যগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য থাকে না আমাদের

ভোক্তাদের কাছে। মুখরোচক খাবারের চড়া স্বাদে অভ্যস্ত করে ফেলছি শিশুদের। পাশ্চাত্যে এর কুফল এত দিনে স্পষ্ট হয়েছে এবং তারা যথেষ্ট সতর্কও হতে পেরেছে। শিশুদের অতিরিক্ত ওজন, হৃদ্‌রোগ এবং ডায়াবেটিস থেকে বাঁচাতে স্কুলসমূহে সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হয়, তা নিয়ে নিয়মিত প্রচার করা হয়। যেভাবে সুপারমার্কেটে খাবার সাজিয়ে রাখা হয়, তা-ও শিশুদের সুস্থ খাদ্যাভ্যাসের উপযোগী করার চেষ্টা চলেছে। বাংলাদেশে এ সব কাজের প্রায় কিছুই হয়নি।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জটা এখানেই বলে মনে হয়। খাদ্য উৎপাদন, বিতরণ, পরিবেশন - পুরো প্রক্রিয়াটিতেই সুরক্ষার ভাবনাটা কীভাবে আনা যায়, তার জন্য জাতীয়ভাবে একটা সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। ২০১৯ সালে নিরাপদ খাদ্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্যে ভেজালকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন এটা সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ-মাদকের মতোই ভয়ংকর। তাই নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আমাদের যে ভয়, তা যেন বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে হয় সেদিকে আমাদের বেশি নজর দিতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ের ফুড সেফটি ল্যাবের কথা আনেককাল ধরে বলা হচ্ছে যেখানে নিরাপদ খাদ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমন্বিত গবেষণা চালানো হবে এবং দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে তার ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হবে। আমাদের দেশীয় খাদ্যের মান আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সহ আরও যেসব বিভাগ ও সংস্থা খাদ্য মান নিশ্চিতে কাজ করে, তাদের সমন্বয়ের কোন বিকল্প নেই। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার। সতর্কতামূলক প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ বিধি যে মানুষের মাঝে প্রভাব ফেলতে পারে, ধূমপানের ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখেছি। প্রকাশ্যে ধূমপান নেই। প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ সেখানে কার্যকর হয়েছে। খাবারের ক্ষেত্রেও কোনটি কুখাদ্য, কোনটি উপকারী, তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার। এতে প্রলোভন অতিক্রম করে খাবারের ভালমন্দ যাচাই করে খেতে শেখার অভ্যাস তৈরি হতে পারে।

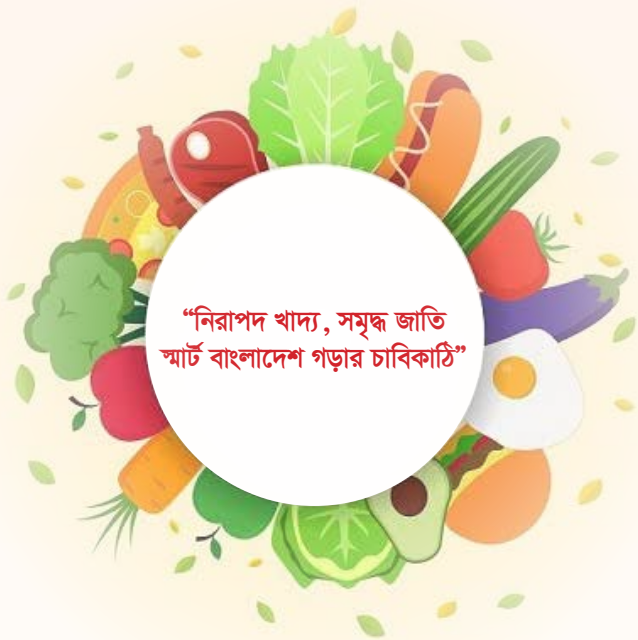

নীরব ঘাতক উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে প্রয়োজন পরিমিত লবণ গ্রহণ

অধ্যাপক সোহেল রেজা চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান
রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার হার খুব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। উচ্চ রক্তচাপ বলতে বুঝায়, যদি রক্তের সিস্টোলিক প্রেশার ১৪০ মিমি মার্কারি বা তার বেশি ও ডায়াস্টোলিক প্রেশার ৯০ মিমি মার্কারি বা তার বেশি থাকে। দেশে প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন (২১%) উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এর বাইরে এখনো বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের রক্তচাপ জানেন না। হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনী রোগ, পক্ষাঘাত, অন্ধত্বসহ নানাবিধ জটিল অসুখের জন্য উচ্চ রক্তচাপ একটা মারাত্মক রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকির কারণ।

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয়। কারণ, এই রোগের কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ থাকে না। ফলে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, তিনি যদি পরিমাপ না করেন তাহলে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয় তিনি এই রোগে আক্রান্ত। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা। যদি দেখা যায়, তার রক্তচাপ বেশি, তখন জীবনাচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে ও নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করতে সবার উচিৎ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা মেনে চলা।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসজনিত পরিবর্তন আনা অর্থাৎ লবণ কম গ্রহণ করা। উচ্চ রক্তচাপ এবং লবণ গ্রহণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যা বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা বহুলভাবে স্বীকৃত। লবণের সোডিয়াম রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়, ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। খাদ্যে লবণের পরিমাণ হ্রাস করা হলে তা শুধুমাত্র উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ কমায় না, বরং হৃদরোগ থেকেও নিরাপদ রাখে।

উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির জন্য দৈনিক লবণ গ্রহণের মাত্রা ৫ গ্রাম (১ চা চামচ) নির্ধারণ করেছে। কিন্তু একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের জনগণ দৈনিক বিভিন্ন খাদ্যে নির্ধারিত মাত্রার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ লবণ গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত খাবারের স্বাদ বাড়াতে বেশি লবণ ব্যবহার করা হয়। অনেকেই ভাত-তরকারির সাথে আলগা লবণ নিয়ে থাকেন। খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন- কেচাপ, সয়া সস, টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করে থাকি। এসবে প্রচুর পরিমাণ লবণ থাকে। বর্তমানে ব্যস্ত জীবনযাত্রার জন্য অনেকে বাজার থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাবার কিনে আনেন, যাতে অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করা হয়। শুধু রান্না বা প্রক্রিয়াজাত খাবারেই নয়, বরং আমরা সিদ্ধ ডিম কিংবা বিভিন্ন কাঁচা ফলমূলও লবণ দিয়ে মাখিয়ে খাই, যা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদিকে ফাস্টফুড, তেলে ভাজা খাবার, কাবাব সহ বিভিন্ন মজাদার খাদ্যে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি লবণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু চাইনিজ খাবারে ২০ গ্রামেরও বেশি লবণ থাকে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত ৫ গ্রামের চারগুণ। প্রকৃতপক্ষে লবণ খাওয়ার কুফল নিয়ে আমরা তেমন চিন্তাই করি না। শুধু জিহ্বার স্বাদের জন্য আমরা মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৫ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে লবণ গ্রহণের মাত্রা ৩০ ভাগ কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। দৈনিক লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের রান্নাঘর থেকেই। এজন্য দিনের শুরুতে রান্নার জন্য নির্ধারিত পরিমাণের লবণ আলাদা করে নিতে হবে। ধরা যাক, কোনো পরিবারে ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আছেন। তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান জনপ্রতি দৈনিক ৫ গ্রাম হিসেবে পরিবারটির জন্য একদিনে ২০ গ্রাম লবণ প্রয়োজন। সেই হিসেবে দিনের শুরুতে রান্নার জন্য ৪ চামচ বা ২০ গ্রাম লবণ আলাদা করে নিতে হবে। এরপর সেই লবণ দিয়েই সারাদিনের সব রান্না শেষ করতে হবে। খাবারের স্বাদ বাড়াতে লবণের পরিবর্তে টক দই, লেবুর রস ব্যবহার করা যেতে পারে। যারা অধিক লবণ খেয়ে অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কিছুদিন স্বাদ কম মনে হলেও, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা অল্প লবণে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণের মাত্রা নির্ধারণ করতে সরকার ও খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লবণ ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্য ক্রয় করার সময় ভোক্তারা যাতে খাদ্যে লবণের পরিমাণ দেখে কিনতে পারে সেজন্য মোড়কে লবণের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ফ্রন্ট-অব-প্যাক লেবেলিং চালু করা অত্যন্ত জরুরি। সেই সাথে পণ্যের মোড়কে ট্রাফিক লাইট ল্যাবেলিং সিস্টেমের আলোকে লাল, হলুদ ও সবুজ মার্কিং করা যেতে পারে, যাতে এই মার্কিং দেখে মানুষ বুঝতে পারে খাবারটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নাকি ক্ষতিকর। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিৎ, নিয়মিত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের গুণমান এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।

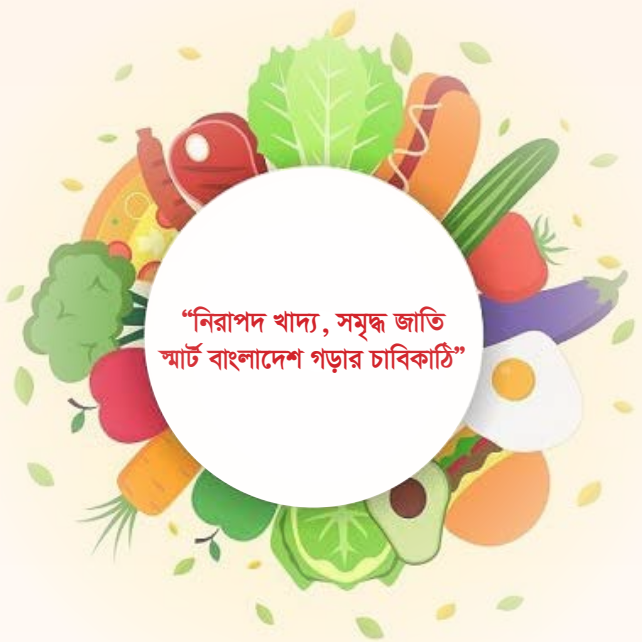

FOOD SAFETY AND FOOD MICROBIOLOGY

Dr. Sahadev Chandra Saha
Director
Bangladesh Food Safety Authority

Man's basic needs include air that contain and adequate amount of oxygen, water that is potable, edible food and shelter. Food provides man with a source of energy needed for work and for chemical reactions that occurs in this body. Food also supplies chemicals needed for growth, for repair of injured or worn-out cells, and for reproduction. Food particularly safe food is so necessary for our existence that the search for food has been the main occupation of humans throughout history.

Food safety is a major focus of food microbiology. Numerous agents of disease and pathogens are readily transmitted via food which includes bacteria and viruses. Microbial toxins are also possible contaminants of food. However, microorganisms and their products can also be used to combat these pathogenic microbes. Probiotic bacteria, including those that produce bacteriocins can kill and inhibit pathogens. Alternatively, purified bacteriocins such as nisin can be added directly to food products. Finally, bacteriophages, viruses that only infect bacteria can be used to kill bacterial pathogens. Thorough preparation of food, including proper cooking, eliminates most bacteria and viruses. However, toxins produced by contaminants may not be liable to change to non-toxic forms by heating or cooking the contaminated food due to other safety conditions.

In a country with well-stocked supermarkets, it might be assumed that the search for an adequate food supply has been successful. However, there are some people do not eat enough safety and nutritious food needed for a healthy and productive life.

Food Safety:

Food safety refers to the practices that are observed during the handling, processing, and distribution of food to ensure that contaminants that can cause foodborne illnesses are not present.

Food safety is a collective effort from all the members of the food supply chain.

"Why is food safety important?"

All members of the food supply chain play a role in maintaining food safety. Whether you are a food supplier, a food business owner, a manufacturer, or a customer, you have a significant part in food safety. This aspect of the food supply chain aims to protect customers from food poisoning and foodborne illnesses that can affect human life and business performance for establishment owners.

Recent data released by the World Health Organization have estimated that at least 600 million people all over the world become inflicted with foodborne illnesses after consuming unsafe food. Of these people, at least 420,000 people die every year. Economic progress can become affected by productivity loss and medical expenses as a result of a foodborne disease burden.

The majority of food safety issues are caused by pathogenic microorganisms such as bacteria that cause food poisoning or food intoxication. They can cause mild to fatal health consequences that include watery diarrhea, vomiting, abdominal pain, or even debilitating infections and long-term diseases. The consequences of food safety issues may have fatal outcomes for both food business owners and consumers.

Basic and everyday foods can easily become contaminated. Some examples of foods involved in common illnesses include high-risk ingredients and any perishable food such as eggs, poultry, fresh fruits, raw meat or deli meats, deli seafood salads, undercooked seafood, ground meat, raw sprouts, and raw milk products. These ingredients can become contaminated by intestinal pathogens such as bacteria and cause infection if preventive measures are not applied.

Food Safety Divided into causative categories called “hazards”

- Biological Hazards - bacteria, viruses, molds, natural occurring toxins
- Chemical Hazards – chemicals like petroleum, herbicides, pesticides, heavy metals etc.
- Physical Hazards – glass, rocks, wood, splinters, hairs, nails, pins etc.

Diseases caused by consuming unsafe food such as-

Tuberculosis, Pneumonia, Diarrhea, Heart disease, Liver disease, Hypertension/Stroke, Cancer, Bronchitis, Diabetes, Kidney disease etc.

Microorganisms: A number of microorganisms are associated with unsafe food which cause different type of human disease.

Organisms such as bacteria, parasites, viruses, yeasts, and molds – Usually too small to be seen by the naked eye.

Where are microorganisms?

Soil & Water, Plants/Products, Utensils/Equipment’s, Gastrointestinal Tract of Human & Animal, Food Handlers, Animal Feeds, Animal Hides, Air & Dust-Finally “EVERYWHERE”.

Food Microbiology

Microorganisms in Food are important in many different ways: Pathogenic, or disease-causing microorganisms can cause illness.

Such disease-causing bacteria are-*Salmonella spp*. are the causal organism of typhoid and other enteric fever. Vibrio sp. The causal organism of cholera. *Clostridium* the causal of botulism and vomiting and *Bacillus anthracis* is the causal organism of anthrax, *Mycobacterium tuberculosis* the causal organism of tuberculosis, Brucella abortus is the causal organism of brucellosis, Coxiella burnetti is the causal organism of Q-fever and *Corynebacterium diphtheriae* is the causal organism of diphtheria etc.

Spoilage microorganisms cause a food to smell, taste, and look unacceptable. Fermentation microorganisms produce a desired food product. Other microorganisms do nothing in foods.

A number of microorganisms are there which are cause of food spoilage ultimate result economic loss. Such type of spoilage microorganisms associated with food degradation are listed below.

Fruits

A large and varied populations of microorganisms including bacteria and many types of fungi contaminate the surface of fruits during growing season as well as harvesting period. The microbial defects of fruits are-

Fruits	Spoilage	Organisms
Fresh fruits	Blue mold rot, soft rot	*Penicillium expansum*
	Black mold rot	*Aspergillus niger*
	Souring, bitter flavor	*Streptococcus faecalis*
Bananas	Storage rot	*Colletotrichum* sp.
Citrus fruits	Soft rot & Black rot	*Penicillium* & *Alternaria*
Guava	Anthracnose rot	*Colletotrichum* sp.
Fruit Juice	Souring & gas $C0_{2,}$ Acetification & Vinegar, Moldy surface, Cloudy, Alcohol	*Lactobacillus*, *Acetobacter*, *Penicillium*, Nonfermenting yeasts, Fermenting yeasts.

Vegetables

Since vegetables are harvested from or near the soil, they are subjected to a heterogeneous flora of soil, as well as air and water borne microorganisms. In general, the pH of vegetables is near neutrality, so that bacteria, as well as fungi, cause deterioration. Due to the lower pH of tomatoes, the spoilage is similar to that of fruit, although bacterial spoilage also occurs. The microbial defects of vegetables are-

Vegetables	Spoilage	Microorganisms
Fresh vegetables	Soft rot, Mushi	*Erwinia carotovora*, *Pseudomonas fluorescens*
	Soft black rot, Black mold rot, blue mold rot	*Alternaria* sp., *Rhizopus nigricans, Aspergillus niger, Penicillium* sp.
Beans	Anthracnose, Blight	*Colletotrichum*, *Xanthomonas*
Cabbage	Leaf spot	*Aalternaria*
Carrots	Soft rot, Fungal rot	*Erwinia carotovora, Rhizopus stolonifer, Fusarium* sp.
Onions	Neck rot, Rot Black mold	*Botrytis allii,* *Pseudomonas cepacian,* *Aspergillus niger*
Potatoes	Ring rot, Dry rot Lateblight	*Corynebacterium,* *Fusarium* *Photphthora infestans*
Tomatoes	Fungal rot, Bacterial spot	*Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Colletotrichum,* *Penicillum* *Xanthomonas* sp.

Other Carbohydrate foods

The microbial degradation of carbohydrate foods like cereals, honey biscuits and candy ordinarily have water activities too low to support the growth of bacteria. However, due to storage at high relative humidity or production of water by metabolism, bacteria can be responsible for the spoilage of these type of food.

Food	Spoilage	Microorganisms
Bread	Ropy, slime Black mold Blue mold Pink mold Sour	Bacillus subtilis Rhizopus nigricans Penicillium spp. Neurospora Lactic acid or coliform bacteria
Candy/ Chocolate cream	Fermentation	Yeasts
Cereals, grains	Moldy Discoloration	Aspergillus, Penicillum Rhizopus nigricans
Wheat	Pink	Erwinia rhapontici
Corn	Blu-eye	Penicillum martensii
Coconut	Rancidity	Micrococcus luteus, Bacillus subtilis
Honey	Fermented, yeasty	Torulopsis, osmophilic yeasts
Peanuts	Moldy	Fusarium, Aspergillus, Penicillum
Soft drinks	Turbidity	Yeasts

Animal Products

Since fresh animal products are perishable, they are chilled and stored in ice or a refrigerator (0^0-4^0C). Frozen Animal products like meat and fish stored in -18^0C or below. This means the psychrotrophs (cold loving /tolerance microorganisms) become dominant and are primarily cause of spoilage. If these fresh products are allowed to remain at room temperature (20^0C), a diverse microflora may be present, since not only will many psychrotrophs grow, but also there will be some mesophilic organism will grow.

The organisms most often involved with spoilage of refrigerated fresh meat, poultry, fish and eggs are species of genus Pseudomonas. Pseudomonas putrefaciens has been designated as being important in spoilage of meat and poultry. Salmonella, Acinetobacter-Moraxella and E. coli are also noted as spoilage organism of fish, meat and poultry.

Dairy Products

Milk, when obtained from cow, may not be sterile, During or after milking, the milk is subjected to microorganisms from various sources, although contaminated equipment used to handle, hide, Cow- dung and urine, transport, store, and process the milk seems to be the main source of organisms. Some microbial defects of dairy products are shown-

Food	defect	Microorganisms
Milk-Pasteurized, refrigerated	Rancid Ropy or slimy Sour (acid, gas) Discoloration Bitter, Fruty	Pseudomonas, Alcaligens,Staphylococcus Coliforms, Pseudomonas, Alcaligens, Micrococcus, Bacillus subtilis Lactic acid bacteria Chromobacterium Pseudomonas, Flavobacterium Alcaligens, Proteus, Acinetobacter
Cream	Foamy	Candida
Butter	Surface taint	Pseudomonas, Alteromonas
Cheese Soft margarine	Gassy Moldy Black mold	Clostridium Penicillium,Scopulariopsis, Mucor & other molds Mucor
Cottage cheese	Slimy curd, putrid odor	Pseudomonas, Flavobacterium, Yeasts, molds
Sweet curd	Slimy, gelatinous	Klebsiella, Pseudomonas, Alcaligens, Flavobacterium
Yogurt	Yeasty	Yeasts

Fats and Oils

Rancidity, acidity, soapiness and off-flavor defects can occur in fatty foods, such as butter, margarine, lard and vegetable oils. The development of rancidity can be due to autoxidative deterioration, lipolysis by microbial lipases or lipoxidaton due to lipoxidase enzymes. There are several lipolytic microorganisms such as Bacteria like- Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligens, Bacillus, Chromobacterium, Corynebacterium, Enterobacter, Flavobacterium, Lctobacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus, Streptomyces.

Fungi are- Absidia, Alternaria, Aspergillus Candida, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Neurospora, Penicillium, Rhizopus etc.

Prevention of Foodborne Illness

1) Cook- Cook all meat, poultry and eggs to at least 160F. Other than spore-forming bacteria, all bacteria, parasites and viruses are killed quite easily with heating to 160F.

2) Avoid Cross-Contamination- Do not crosscontaminate one food with another. Keep raw food totally separated from cooked product. Clean utensils and work areas etc. in between working raw and cooked product. Constantly be thinking of how microorganisms get from raw to cooked products.

3) Chill Foods- Keep foods cold. After cooking, chill foods as rapidly as possible. Remember that cooking has destroyed most of the bacteria but spore formers, that are resistant to cooking may become very active and can proliferate rapidly.

4) Cleaning-Wash fruits and vegetables and all foods possible. In addition, continually wash work areas. Use only treated or tested water.

5)Personal Hygiene- People working with foods should wash their hands regularly, wear hairnets, plastic gloves etc. In addition, food handlers should not work with food if they have a boil, open sores or feel sick themselves

Useful Microorganisms

Though microorganisms are associated with our food threats apart from that a number of microorganisms are used in many facts of the food industry. Desired alterations of food by microorganisms are refer to as fermentations, regardless of the type of metabolism. The actions of microorganisms on foods called food conversions. The conversion of one food to another may be called controlled degradation. A number of microorganisms are involved in these food conversions such as- Lactic acid bacteria, Acetobacter, Leuconostocs, Pediococcus, Streptococcus, Propionibacterium, Brevibacterium.

Some fungi are – Penicillium, Saccharomyces, Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Neurospora etc.

Conclusion

Food microbiology is the integral part of food safety. Before considering the food safety we must need to know about food microbiology. Each member of the food supply chain has a role to play in the food safety and food microbiology concept. All roles are vital and invaluable in the process. Whether you are a food business owner, government personnel, or a customer, your role cannot be replaced. Food safety is everyone›s responsibility. Microorganisms can destroy our food, destroy our health and economy but with reconstruction of our desired food with appropriate organism which may help us to give a better true life.

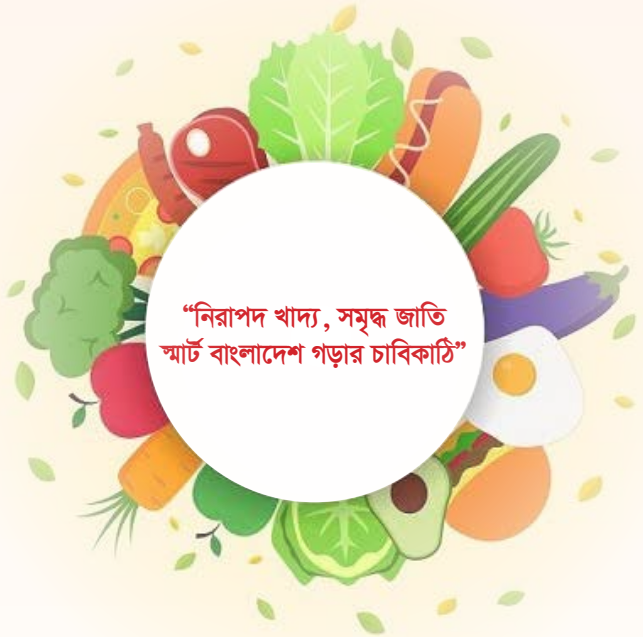

নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ: বর্জ্য ও উচ্ছিষ্ট খাবার ব্যবস্থাপনা

কাওসারুল ইসলাম সিকদার
অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও উন্নত সমাজের পরিচায়ক। যে দেশ যত সভ্য ও উন্নত, সে দেশের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও তত উন্নত। আধুনিক ও উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূলত উন্নত রুচি ও মননের পরিচয় বহন করে। সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনধারণের কোনো বিকল্প নেই। আবার নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও জমি ব্যবস্থাপনা হতে খাদ্যগ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক। সে জন্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকা চাই। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্য ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ যেমনি জরুরি, তেমনি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের প্রতিটি স্তরে উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও জরুরি। কারণ বর্জ্য থেকেই খাদ্যে জীবাণুর সংক্রমণ ও দূষণ ঘটে। সে দূষণ হতে পারে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক। তাই উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে খাদ্যকে এ সকল দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন হতে হবে।

বর্জ্য বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে ব্যবহারের পর যা ফেলে দিই তাকেই বুঝি। আবার অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুও বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট উপাদান বা উপকরণ একজনের নিকট বর্জ্য হলেও অন্যজনের নিকট তা কাঁচামাল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মূলত ঘনবসতি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন–সর্বোপরি আধুনিকায়ন বর্জ্যের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবার হতে প্রতিনিয়ত বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। এই বর্জ্য কঠিন, তরল, কিংবা বায়বীয় হতে পারে। সেই সাথে কোনো কোনো বর্জ্য পরিবেশ ও মানবদেহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ আবার কোনোটি ঝুঁকিমুক্তও হতে পারে। উৎসভিত্তিক বর্জ্যকে যদি পৃথক করা হয় তবে দেখা যায়, কিছু বর্জ্য হতে রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়, তা মানবজীবনসহ সকল প্রাণিজগতের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। এ সকল বিবেচনায় নিউক্লিয়ার, রেডিওলজিক্যাল, ইলেকট্রনিক, শিল্পের (রাসায়নিক) ও মেডিক্যাল বর্জ্য সামগ্রিক পরিবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ ক্ষতি হতে পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু) এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল–কেউ নিরাপদ নয়। এ ধরনের বর্জ্যের পরিমাণ উন্নত বিশ্বের সাথে সাথে অনুন্নত বিশ্বেও বাড়ছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো বাড়বে। অন্যদিকে কৃষি ও গৃহস্থালিকাজের মাধ্যমে যে বর্জ্য তৈরি হয়, তার ঝুঁকির মাত্রা প্রযুক্তিগত বর্জ্যের তুলনায় কম। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাসে সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সবাইকেই সচেতন হতে হবে, যাতে মানুষকে বর্জ্যের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন না হতে হয়।

সচরাচর আমরা মূলত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করি। এ সকল বর্জ্যের মধ্যে খাদ্যসংশ্লিষ্ট সবুজ উদ্ভিদ উপাদান, কাচ, ধাতব পদার্থ, কাগজ, প্লাস্টিক, রাবার, চামড়া ও কাঠ প্রধান। এগুলোর মধ্যে কাগজের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তাই এই বর্জ্য এখন বেশি চোখে পড়ে। কাগজের পরে খাদ্য ও কৃষিসংশ্লিষ্ট উপাদান ও প্লাস্টিকের ব্যবহার ঘটছে। আধুনিক সমাজে রাবার, চামড়া ও কাপড়ের বর্জ্যের পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়ছে। খনি, নির্মাণশিল্প ও পানি শোধনাগার হতেও বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। শহর ও গ্রামের মানুষের বর্জ্যের ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। এ ছাড়া বর্জ্যের ধরনের ভিন্নতা আয়ের মাত্রার ওপরও নির্ভর করে। গ্রামের এবং নিম্ন আয়ের মানুষ দ্বারা সাধারণত অর্গানিক বর্জ্য বেশি তৈরি হয়। আবার রাবার, প্লাস্টিক, লেদার ও প্রযুক্তির ব্যবহার উচ্চ আয়ের ও নগরজীবনের মানুষের মধ্যে বেশি ঘটে। সেই কারণে নগরে অর্গানিকের তুলনায় রিসাইকেলযোগ্য ও অজৈব বর্জ্য বেশি তৈরি হয়। তাই গ্রামের ও শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভিন্ন।

আধুনিকায়ন, নগরায়ণ ও প্রযুক্তিগত কারণে বর্জ্যের ধরন ও পরিমাণ নির্ভর করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যেহেতু নতুন নতুন বর্জ্য যোগ হচ্ছে, সেহেতু নতুন নতুন বর্জ্যের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনাও অবলম্বন করতে হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শুরুতে জৈব ও অজৈব–মূলত এই দুই ভাগেই বিভক্ত ছিল। অজৈব বলতে টিন ও লোহাজাতীয় পদার্থকেই বোঝা যেত। পরবর্তীতে প্লাস্টিক, রাবার, কাগজ, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বর্জ্য যুক্ত হয়েছে এবং এগুলো প্রায় সবই রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য। তাই বর্তমানে রিসাইকেলের আওতা ক্রমেই বাড়ছে এবং আধুনিক নগর জীবনে এই সকল উপকরণ পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও আধুনিক জীবনে এই সংখ্যা বাড়বেই, তবে কতটুকু বাড়বে সেটি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট জনপদের মানুষের জীবনযাত্রার মান, ধরন, আয় ও প্রযুক্তিগত পণ্য ব্যবহারের ওপর। জৈব বা অর্গানিক বর্জ্যের মধ্যে সবুজ উদ্ভিদ, কাঠ ও খাবার–এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে উন্নত দেশে বর্জ্য সংরক্ষণের প্রয়াস চলছে। বিশেষ করে উচ্ছিষ্ট খাবার, যা মানুষ ফেলে দেয়, তা পশু-পাখি ও নিকৃষ্ট প্রাণীর খাবার হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। সেই ধারণা হতেই কোরিয়াতে উচ্ছিষ্ট খাবার পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা এই খাবার সংগ্রহ করে পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীর মাঝে বিতরণ করে। এ ব্যবস্থায় একদিকে খাদ্যের অপচয় রোধ করা যাচ্ছে, অন্যদিকে মানুষের সাথে সাথে অন্য প্রাণিকূলের খাদ্য নিরাপত্তাও জোরদার হচ্ছে। বর্জ্য সংরক্ষণে যে সকল ডাস্টবিন ব্যবহার করা হয়, তাতে বড় কালো পলিথিন স্থাপন করা হয়; যাতে বর্জ্য কালো পলিথিনে জমা হতে পারে। এ ব্যবস্থাপনায় ডাস্টবিনের গায়ে ময়লা বা জীবাণু বিস্তারের সুযোগ কমে যায়। আমাদের দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো তেমন উন্নত হয়নি। সে কারণে একদিকে সম্পদের অপচয় ঘটছে, অন্যদিকে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সেই সাথে মানবস্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আমাদের দেশের জনবহুল শহরগুলোতে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতে রান্নাঘরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। বিশেষ করে রান্নাবান্নার কাজে যাঁরা জড়িত থাকেন তাঁদের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক দূষণ সম্পর্কে জানতে হবে এবং সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। দূষণ হতে বাঁচতে হলে প্রথমত রান্নাঘরে কোনো ডাস্টবিন রাখা যাবে না। ডাস্টবিন রাখতে হবে রান্নাঘরের বাইরে। ডাস্টবিন হতে দুর্গন্ধ ও জীবাণু খাবারে যেন না ছড়ায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সে জন্য ডাস্টবিন ঢাকনাযুক্ত হতে হবে। ডাস্টবিন পা দ্বারা চালিত হতে হবে, যাতে হাতে জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটে। ডাস্টবিন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে। ভেতরে বড় পলিথিন স্থাপন করতে হবে, যাতে ময়লা পলিথিনে জমা হয় এবং পলিথিনের মাধ্যমে আবার ময়লা অপসারিত হয়। একই সাথে জীবাণু বিস্তারকারী টয়লেটসমূহ রান্নাঘর হতে দূরে স্থাপন করতে হবে এবং টয়লেটসমূহ জীবাণুমুক্ত রাখতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। জৈব, অজৈব (রিসাইকলযোগ্য ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য) বর্জ্য অনেক ক্ষেত্রে একই ডাস্টবিনে জমা করা হয়, যা অনুচিত। এতে একদিকে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ময়লা হয়ে যায় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই জৈব ও অজৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সকলকে সচেতন হতে হবে। সেই সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। উচ্ছিষ্ট খাবার হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পারিবারিক রান্নাঘর হতে নর্দমা বা ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়। এতে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের খাবার পশু-পাখি ও নিকৃষ্ট প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য। তাই উচ্ছিষ্ট ও পচা খাবার সংরক্ষণ ও উপর্যুক্ত প্রাণীকে প্রদান করে প্রাণীদের খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত করা যায়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পাদনে একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রথমত, বর্জ্য যাতে কম হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহার করতে হবে। তৃতীয়ত, রিসাইক্লিং বা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। চতুর্থত, জ্বালানি হিসেবে বর্জ্য ব্যবহার করতে হবে। পঞ্চমত, বর্জ্য দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন পর্যন্ত খুব একটা ঘটেনি। সাধারণত গরিব ও ছোট বাচ্চারা বর্জ্য ফেলার স্থান ও ডাস্টবিন হতে রিসাইকেলযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করে। এতে তারা স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হয়। আবার বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত ডাস্টবিন না থাকায় সকল বর্জ্য একই ডাস্টবিনে রাখা হয়। এ কারণে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যসমূহ নোংরা হয়ে যায়, এতে বর্জ্যের গুণগত মানও নষ্ট হয়। সেই সাথে এ সকল উপকরণ পরিষ্কারে বাড়তি খরচ হয় এবং পানির অপচয় ঘটে। তাই বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী পৃথক পৃথক ডাস্টবিন (ভিন্ন রং ও ছবিসংবলিত) আমাদের ব্যবহার করতে হবে। উন্নত নাগরিক জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য মানব ও পশুর মলমূত্রের উন্নত ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এ ধরনের বর্জ্য আমাদের দেশে উন্মুক্ত নালার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে এবং উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দেশে উন্মুক্ত টয়লেটের সংখ্যা কমলেও টয়লেটের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। উন্নত বিশ্বের বাস ও ট্রেন স্টেশনে টয়লেটের যে পরিবেশ দেখা যায় তা আমাদের পাঁচতারা হোটেলের সমমানের। যা থেকে আমাদের রুচি পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়।

পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য সংরক্ষণ ও রিসাইকলের পাশাপাশি নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা করতে হবে। যে স্থানে বর্জ্য রাখা হয়, তা হতে যেন দূষণ না ছড়ায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিশু ও মহিলাদের ডাস্টবিন বা ময়লা সংরক্ষণাগারে প্রবেশ রোধ করতে হবে। বর্জ্য সংরক্ষণাগারে শাক-সবজি, ফলমূলের উৎপাদন করা যাবে না। সেখানে কাঠজাতীয় গাছ লাগানো যেতে পারে। যত্রতত্র প্লাস্টিক পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। নগরের নিকটবর্তী নদী-নালা, খাল-বিলসমূহ বর্জ্যদূষণ হতে রক্ষা করতে হবে। মানবস্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর চামড়াসহ অন্যান্য শিল্পের বর্জ্য, মেডিক্যাল এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বিশেষ ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত না হওয়ায় দেশের মাটি, পানি, বায়ুসহ সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানবস্বাস্থ্যসহ সকল প্রাণিকুল ও উদ্ভিদজগৎ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। বর্জ্যের দূষণে খাদ্যশৃঙ্খলে মারাত্মক দূষণ ও বিষক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অতীব জরুরি। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও নীতির পাশাপাশি বর্জ্য সৃষ্টিকারী সকল অংশীজনের সচেতনতা দরকার। তাই প্রয়োজন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পৃথক গাইডলাইন তৈরি করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। রেস্তোরাঁ এবং তারকা সমৃদ্ধ মোটেলসমূহে যে খাবার অবশিষ্ট থাকে তা প্রায়শই ফেলে দেওয়া হয়। তাই এসকল খাবার যাতে অপচয় না হয় এবং পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য উচ্ছিষ্ট খাবার সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি প্রবিধানমালা তৈরি করতে পারে। এতে নিম্নশ্রেণির প্রাণীর খাদ্য নিরাপত্তাও বাড়বে। সেই সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যাতে পরিবেশ রক্ষা পায় এবং মানবস্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত থাকে।

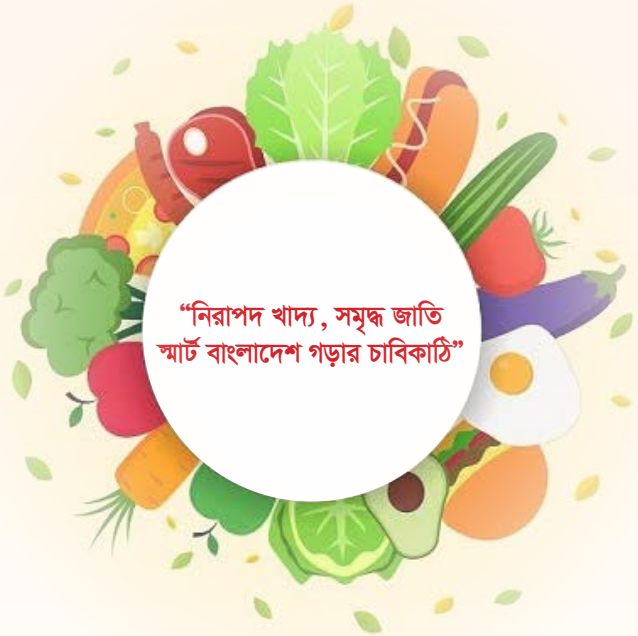

নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

রেজাউল করিম সিদ্দিক
সাধারণ সম্পাদক, বিসেফ ফাউন্ডেশন
উপস্থাপক, মাটি ও মানুষ

খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে কাজ করছেন সবাই। খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এখন অনেক সচেতন কিভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র এবং সরকার ঘোষিত ভিশন ২০৪১ এর আলোকে পুষ্টি নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবাই সচেষ্ট।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। বেড়েছে চালের উৎপাদন, সবজির উৎপাদন। দুধ, মাংস, ডিমের উৎপাদনও বাড়ছে। ঘাটতি উৎপাদনের সমস্যা অতিক্রম করে দেশ এখন বাড়তি উৎপাদনের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। কোভিড এবং ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধেও কারণে একটি বিশ্ব সংকটের মাঝে থাকার পরও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো অনেক দেশের চেয়ে শক্ত অবস্থানে রয়েছে। যে কারণে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, প্রবৃদ্ধিও কম নয়। মানুষের সক্ষমতা যাই থাকুক নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে সর্বত্র।

খাদ্য মানেই সেটা হতে হবে নিরাপদ। সংজ্ঞা অনুযায়ী যা শরীরের পুষ্টি সরবরাহ করে, মগজের বৃদ্ধি ঘটায়, রোগ বালাই প্রতিরোধের শক্তি তৈরি করে সেটাই খাদ্য। যা পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করে না, যা রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে রোগ বালাইয়ের বিস্তার ঘটায় সেটি খাদ্য হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই সেটি অখাদ্য। তাই যে কোনো খাদ্যে নিরপদতার তকমা লাগানোর কোনো প্রয়োজন থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব হলেও সত্য এটা নিয়ে এখনো নানা বিভ্রান্তি বিদ্যমান। বিশেষত কৃষি পণ্যেও ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি বেশি। কেউ কেউ মনে করেন কীটনাশক প্রয়োগ করলেই খাদ্য অখাদ্য হয়ে যায়। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা যে সব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন সেগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগালে একই সাথে পুষ্টি নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। সংকট কেবল জ্ঞানকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে।

খাদ্য নিয়ে কাজ করে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা। কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। খাদ্য উৎপাদন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। খাদ্যের গুণগত মান ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে খাদ্য মন্ত্রণালয়। প্রক্রিয়াজাত করা খাদ্যের গুণগত মান দেখার জন্য আছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিএসটিআই। খাদ্য আমদানীর কাজে যুক্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। খাদ্য বিক্রয়ের বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। আপাত দৃষ্টিতে দেখা না গেলেও কত সংস্থা যে এর সাথে জড়িত তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সবার কাজ যে একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছে সেটা বলা যাবে না।

উৎপাদনকারী যেই হোক, নিয়ন্ত্রণ যেই করুক, দিন শেষে আমরা সবাই কিন্তু ভোক্তা। সেক্ষেত্রে কতটা সহজে নিরাপদ খাদ্য তৃণমূলে নিশ্চিত করা যায় সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। উৎপাদনকারী নিজের জন্য যেটা উৎপাদন করেন এবং বাজারের জন্য যেটা উৎপাদন করেন সেটি অনেক ক্ষেত্রেই এক নয়। তার কারণ বাজারে নিরাপদ খাদ্যের পৃথক কোনো প্লাটফরম। কৃষক আলাদা কোনো ইনসেনটিভ পান না।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় নেই এটা বললে কেউ স্বীকার করবেন না। তবে বাস্তব কথা হলো সমন্বয়হীনতা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। নিজেদের অহংবোধের কারণে আমরা যুক্তিগুলো সহজেই মানতে চাই না। কার চেয়ে কে বড়, দিন শেষে কার ক্ষমতা কত বেশি সেটিই আমরা দেখে থাকি। এক্ষেত্রে এখনই অনেক উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে যা সবাই কম বেশি জানেন।

খাদ্যের নিরাপদতা দেখার জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন ন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা, খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় খাদ্য সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে এই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি। যদি খাদ্যের মাণ নিয়ন্ত্রণের বিষয় আসে তাহলে দেখা যাবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সকল পণ্যের

মাণ নিয়ন্ত্রণে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী নন। কিন্তু আইন বলছে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। তবে একথাও ঠিক এসব কাজে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

লক্ষ কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ একা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নিরাপদতার যে বিধানগুলো আছে সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সেটির জন্য সম্প্রসারণ অধিদপ্তরগুলো কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে এই পক্ষগুলোর সাথে একটি সুসমন্বিত সম্পর্ক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তর নিরাপদ পণ্য উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এখানে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিরাপদতার নীতি অনুসরণ করেই হচ্ছে। এই কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। বিশেষত কীট নাশক প্রয়োগের নীতিমালা, এন্টিবায়োটিক বা ভিটামিনের ব্যবহার সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটিও দেখা দরকার। কারণ নিরাপদতার নীতি উৎপাদন সেক্টরে সঠিকভাবে অনুসরণ করা না হলে তা তৃণমূলে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারবে না।

সাম্প্রতিক সময়ে শিশু কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ফাস্ট ফুডের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। বেড়েছে বিভিন্ন রকমের পাণীয়ের চাহিদা। এই খাদ্যগুলো বেশি গ্রহণ করলে যে শরীরে নানা রকম সমস্যা হতে পারে সেটা সবাই জানেন। আবার সব খাদ্য নিরাপদতার নীতি অনুসরণ করে যে উৎপাদিত হচ্ছে তা কেউ বলতে পারবে না। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। এই সব পানীয় ও খাদ্যের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা হতে পারে এবং আমাদের তরুণদের সচেতন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এই ধারা চলতে থাকলে পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ থাকবে এটা বলা যাবে না। দেশে যত খাবারের দোকান তার সাথে পাল্লা দিয়ে ওষুদের দোকান ও হাসপাতাল তার বড় প্রমাণ।

নিরাপদতার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পানির ব্যবহার। সেচের পানিতে আর্সেনিক বা হেভি মেটাল থাকলে তা উৎপাদিত পণ্যে প্রভাব ফেলে। আবার কোনো কোনো এলাকায় মাটিও দূষিত থাকতে পারে বিশেষ করে শিল্প বর্জ্যের প্রভাবে। সেখানে উৎপাদিত সবজি, ঘাশ আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে দীর্ঘমেয়াদে বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এই এলাকাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। উৎপাদিত পণ্য অনেকে দূষিত পানি দিয়ে ধুয়ে থাকেন। এর ফলে খাদ্যও দূষিত হয়। বাজারগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা এত খারাপ যে মানসম্পন্ন পণ্যটি বাজারে এসে আবারো দূষণের ঝুঁকিতে পড়ে। বিভিন্ন স্তরে এই নিরাপদতা নিশ্চিত করতে সকল সংস্থারই একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সেখানে সমন্বয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

আবার নাগরিকদেরও রয়েছে অসচেতনতা, ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে রান্না, ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের কারণেও খাদ্য তার পুষ্টিমান হারায়। আমরা জানিনা যে, রান্না করা খাবার আর কাঁচা খাবার একই চেম্বারে রাখা যায় না। আমরা জানিনা পুষ্টিমান বজায় রাখতে কত তাপে আমাদের রান্না করতে হবে। মুখরোচক খাদ্য তৈরি করতে গিয়ে আমরা পুষ্টিমান নষ্ট করে ফেলি। সে খাদ্যে উদরপূর্তি হয়, মুখে স্বাদ লেগে থাকে তবে তা শরীরের কোনো কাজে আসে না। বরং অতিরিক্ত মশলা ও চর্বিযুক্ত খাদ্য শরীরের জন্য রোগ ব্যধিকে আমন্ত্রণ জানায়।

খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে অনেক বেসরকারি উদ্যোগও কাজ করছে। যারা প্রত্যেকে চান নাগরিক সচেতনতা তৈরি করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে। কিন্তু এসব সংস্থার মধ্যেও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এমনকি স্থানীয়ভাবে অনেক সংগঠন রয়েছে যারা স্থানীয় পর্যায়ে এ বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে একটি অভিন্ন প্লাটফরমে নিয়ে আসতে পারলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। এখানে কেউ হয়তো সচেতনতা তৈরিতে অবদান রাখবেন, কেউ হয়তো স্কুলে স্কুলে গড়ে তুলবেন পুষ্টি ক্লাব, কেউ হয়তো বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তা করবেন, কেউ হয়তো কৃষক বা খামারী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখবেন। আবার কেউ কেউ নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ইত্যাদিতে জনমত তৈরি ও পরামর্শ প্রদান করবেন। এই কাজগুলো হবে সম্পুরক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে থাকবেন। কোনো অহংবোধ যেন আমাদের মধ্যে ভিন্নমত তৈরি করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যখনই কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অহংবোধ তৈরি হয় তখনই তৈরি হয় বিচ্ছিন্নতা, মতপার্থক্যের সূত্রপাত সেখানেই। আমাদের এক থাকার সূত্র একটি আর বিভাজনের সূত্র অনেক।

নিরাপদ খাদ্যের ইস্যুতে কেউ কারো প্রতিপক্ষ নন। প্রত্যেকেই নিরাপদ খাদ্যের গ্রাহক, ভোক্তা। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সবাই এর সাথে আছেন। এই ইস্যু সবচেয়ে বেশি সার্বজনীন এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজন তেমনি পারস্পারিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে। এ কথায় কেউ কেউ মনে করতে পারেন পারস্পারিক শ্রদ্ধা কি অভাব আছে কোথাও? হয়তো নেই। না থাকাই সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু অন্যকে অবজ্ঞা করে নিজেকে উত্তম বলে প্রমাণ করার চেষ্টা যে নেই সেটি বলা যাবে না।

একই কথা নাগরিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নাগরিক সংগঠনগুলো একে অপরের সহায়ক শক্তি হিসেবে যেমন থাকবেন তেমনি সরকারের প্রতিষ্ঠানের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন। সরকারি সংস্থাগুলো নাগরিক সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়েই কাজ করবেন। এটা মনে রাখতে হবে সরকারের সংস্থাগুলোর মূল দায়িত্ব নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা। সেখানে সকল পক্ষের সম্মিলিত শক্তিই হবে আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন ২০৪১ অর্জনের সফল হাতিয়ার।

icddr,b and BFSA joint undertaking reduced turmeric adulteration by lead chromate in Bangladesh

Dr. Md. Mahbubur Rahman
Principal Investigator

Dr. Musa Baker
Senior Research Officer

Environmental Interventions Unit, icddrb

In 2012, icddr,b conducted a randomized controlled trial, known as WASH-Benefits trial Bangladesh. In this study in a subset of pregnant women's blood tested to measure Blood Lead Level (BLL) and found a high concentration of lead. Pregnant women were recruited from the four districts Gazipur, Mymensingh, Tangail, and Kishoreganj. Study found that 132 (31%) pregnant women had blood lead levels greater than 5µg/dL. We conducted a detailed investigation of those households' behaviors and activities, and three stood out as contributors to elevated blood lead levels: lead-soldered cans, turmeric, and geophagic debris like dirt, clay, or ash. Based on the findings, icddr,b investigated the supply chain by conducting interviews with supply chain participants to learn about turmeric production activities, perceptions, and preferences for turmeric quality. We collected turmeric samples, yellow pigments from the most popular wholesale and retail markets, and dust and soil samples from turmeric polishing mills to assess the signs of adulteration. We measured the lead and chromium concentrations using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and x-ray fluorescence (XRF). We found the highest lead concentration in the samples collected from Dhaka and Munshiganj districts, along with evidence of lead-chromate-based yellow pigment adulteration in 7 of the 9 major turmeric-producing districts.

According to turmeric wholesalers, adding yellow pigments to dried turmeric roots during polishing began more than 30 years ago and is stillpractised today. This study indicates that lead-chromate was added to turmeric by polishers. We analyzed the lead isotopic composition of suspected lead sources and blood samples from pregnant women to confirm the certain sources of lead exposure. Finally, the isotope-based investigation found that turmeric contaminated with lead chromate pigment was the primary cause of high blood lead levels in rural Bangladeshi women.

icddr,b and Stanford synchronized the publishing of two scientific studies between September 6 and 17, 2019. According to the studies, turmeric was the leading cause of lead exposure among women in rural Bangladesh and the practice of adding lead chromate maximized revenues and allowed the selling of low-quality roots. Following media coverage, the team tracked significant local and international outlets such as the BBC, Washington Post, and the top Bangladeshi online and video news channels.

Days after the news release on 23rd September 2019, Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) Chairman, members and icddr,b research team hold an emergency meeting to develop an action plan. We developed educational materials for local turmeric businesspeople and consumers based on the meeting decision. The BFSA is a implementing agency tasked with providing the necessary assistance to those organizations directly involved in updating and upgrading food safety standards or guidelines, determining permissible limits for the use of contaminants and residue, additives or preservatives at its highest safe level. BFSA also coordinated the actions of numerous agencies and organizations involved in food safety control, food production, import, processing, storing, providing, marketing, and sales.

Turmeric is a common culinary spice in South Asia, particularly in Bangladesh, where direct eating of lead-contaminated turmeric exposes people to lead. Food adulteration is a major problem and has reached pandemic proportions in Bangladesh. Moreover, lead is a highly dangerous poison that affects a developing child's brain, which is of particular concern.

On September 25, 2019, the BFSA published a public notice in six national daily newspapers claiming that turmeric adulteration was a serious infraction in breach of the Safe Food Law 2013 and demanding that turmeric businesses refrain from adding pigments to turmeric. An estimated 50,000 copies of the public notice were printed and hung in major bazaars and public areas across the country to aware people. Warned consumers and businesspeople about the dangers of lead, the risks of consuming bright yellow turmeric roots, and the fines that will be imposed on those found adding lead chromate to turmeric. BFSA sent a public notice and letter to the Prime Minister's Office and other ministries who distributed the letter to the District Commissioners within each turmeric-producing district.

Between September and October 2019, icddr,b research team travelled to the major turmeric-producing districts to meet with turmeric producers and processors. The 's goals were to inform them of the risks associated with the consumption of lead chromate pigments and the legal and financial consequences of adding such colors to turmeric. In November 2019, icddr,b hold stakeholder workshop jointly organized by the BFSA to further elaborate on plans to ensure lead chromate turmeric adulteration does not exist in Bangladesh. Attendees joined from key governmental and non-governmental organizations, big and small turmeric packaging companies, and journalists from news agencies. BFSA emphasized the importance of testing and monitoring for lead in turmeric in the domestic market.

BFSA formed a five-person monitoring team and accompanied icddr,b to Dhaka's major wholesale bazaar to conduct spot checks for lead chromate adulteration. On 10th October 2019, icddr,b team along with BFSA personnel monitored wholesale market in Dhaka and utilized XRF to detect lead and chromium and test 23 types of turmeric on-site. During monitoring visits six distinct types of turmeric containing detectable lead were found, and the mobile court penalized two different wholesale stores BDT. 800,000 for violating the 2013 Safe Food Act, along with 900 kg of turmeric was confiscated.

icddr,b assessed lead chromate turmeric adulteration by sampling from the country›s major turmeric wholesale market. Comparative assessments are categorized as September ২০১৯ "pre-intervention" as well as three time points "post-intervention:" winter ২০২০ (January-March), fall ২০২০ (September-November) and winter ২০২১ (January-March). Analysts assessed the lead and chromium concentrations in samples using a handheld XRF analyzer at icddr,b. To calibrate the handheld device, we used a standard set of turmeric samples with known lead concentrations measured at Stanford's Environmental Measurements Facility (em1.stanford.edu) using ICP-MS. To improve XRF measurement accuracy, turmeric roots were ground to a powder prior to measurement. Sample collectors procured 631 samples of turmeric from the major wholesale market in Dhaka. Turmeric lead concentrations decreased over time. Before the collaborative interventions and actions by BFSA and icddr,b the percentage of turmeric samples positive for lead 47% from the major wholesale market in Dhaka compared to 5% following the intervention in Winter 2020, 2.3% in Fall 2020, and no detectable lead in winter 2021 ($p<0.0001$).

On the Food Safety Day 2021 the team received the "Food Safety award" for their outstanding efforts to minimize lead from contaminated turmeric at various levels of the turmeric supply chain. This was a collaborative efforts by Bangladesh Food Safety Authority (BFSA), Stanford University USA and icddr,b.

FOOD SAFETY ASPECTS IN BANGLADESH

Dr. Barun Kanti Saha
CSO
BCSIR, Dhaka

Food is the basic need for all living organisms to continue their life cycles. Food security achievement is the key development priority for all developing countries such as Bangladesh. In Bangladesh food insecurity situation is more severe; overpopulation along with decrease of the land-to-human ratio have made the need for food security of utmost necessity Food and Agriculture Organization (FAO) explains food security as a situation 'when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life'. The definition introduces the food security as a complex situation that involves physical and biological aspects of food production, distribution, and utilization considering food stability throughout the time (WFP,). Thus, food security embraces four key dimensions of food availability, access, utilization, and stability (FAO).

Food safety is to ensure that the food is not harmful for our health as well as full of nutrients. And the securing safe food is all about handling, storing and preparing food in a safely manner to keep us protected from infection and any types acute or chronic discomfort of our health.Food can be contaminated by means of physical, chemical, and microbiological. In Bangladesh, food safety is a major concern of public health because all these three types of contamination have been occurred and causing serious problem. Microbiologically or naturally occurring toxin contaminated foods and productscause's foodborne diseases. This contamination can behappened at any stage, from production to consumption which is actually farm to fork. The failure in the management of good food safety practices is the main reason of foodborne illness. Asignificant number of people are suffered from foodborne illnesses every year. This illness is not only because of the presence of pathogenic microorganisms but also the incidence of health hazard toxic chemicals present in the food. Unsafe as well as contaminated food is the foundation of many acute and chronic diseases, like diarrhoeal diseases to various forms of cancer. Personal hygiene and sanitationcan reduce the foodborne illnesses caused by the contamination of microorganisms.But to reduce the physical and chemical contamination needs proper knowledge and good practices along with a strong regulatory monitoring.

Foodborne diseases brutally affectdeveloping and immune compromised people like infants, young children, elderly people which in the long runforms a vicious cycle of diarrhoea and malnutrition, harms the national economy, and delay development.The most important issues for foodborne illnesses in Bangladesh are lack of food safety practices, insufficient health services, inadequate water and sanitation infrastructure, and finally the fast and unplanned urbanization.To minimize the foodborne illnesses strengthening food safety practice is important. Several foodborne illnesses like Cholera, Anthrax, Nipah, and Hepatitis Ehave been controlled over the past years in Bangladesh.Besides the hygiene and sanitation lack of some good practices like improper heating of the food, such as undercooking, re-heating and waiting in the heat, or improper cooling of the food can also cause foodborne illnesses. According to WHO, globally about 2.2 million people annually, of them 1.9 million are children are killed by food borne and waterborne diarrhoeal diseases. Approximately 0.3 million people were suffering from Acute Watery Diarrhoea (AWD) in Bangladesh in ২০১৫ according to Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), Bangladesh surveillance report. Approximately ০,০৩ million people are suffering from Enteric Fever in Bangladesh in ২০১৫ according to Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), Bangladesh surveillance report.

Very recently, In 2021, and as of 9 May, 50,115 acute watery diarrhoea (AWD) cases were reported in Cox's Bazar only, Bangladesh. Among these cases, 26 tested positive using a cholera rapid diagnostic test or culture.

The food adulteration situation of Bangladesh is also a serious health concern in the context of food safety. Adulteration in food is a growing problem in Bangladesh as large numbers of consumers have become victims of consuming adulterated foods. There is strongconfirmatory evidence of food adulteration with harmful chemicals such as Lead in turmeric; textile colour food products; formalin in fish; fatal food poisoning after eating watermelon. High residues of banned pesticides, and chemical preservatives in fresh produce samples from local markets in Dhaka were also confirmed in several studies in Bangladesh.The chronic effect of chemical hazard like cancer, kidney disorders and birth defects only occurs after long-term, low-level exposure. Lack of the execution of existing Food laws and regulation (Bangladesh Safe Food Act-2013) and low level of awareness are contributing to aggravating the country's food safety situation.

A healthy or safe food is clean, in physical, chemical and microbiological terms. The factors that cause the contamination of the food may threaten the safe consumption of it.So, it is essential to prevent the food from contamination at all stages of the food chain. Strengthening the regulation, proper monitoring, raising awareness, educate farmers in using agro-chemicals and to move towards less toxic alternatives, labeling and packaging to improve traceability ensuring safe water, sanitation, and improved hygiene practice is necessary to increase ever than before. A good agricultural practice (GAP) needs to implement properly by the concern authorities which can reduce food contamination by half. Along with all these preventive measures a comprehensive risk analysis and risk management approach of food safety should be carry out to understand the actual scenario of the food safety condition of Bangladesh.

নিরাপদ ও উৎকৃষ্টমানের ফ্রাইড চিপ্‌স পণ্য উৎপাদনে ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং প্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

ড. মো: গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মো: হাফিজুল হক খান
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর

বাংলাদেশের গত কয়েক দশকের কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অর্জিত কৃষির সাফল্য এখন বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত। দেশের কৃষি এখন আমাদের গর্ব করার মত বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিকল্প নেই যার দরুন কৃষক ও কৃষি পেশার সাথে জড়িত ব্যাক্তিবর্গের শ্রম ও নিরলস প্রচেষ্ঠা এবং কৃষি বান্ধব সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এই পেশাকে যেমন উৎসাহিত করছে তেমনি উন্নয়নের মহাসড়কে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সর্বত্রই এখন কৃষির জয়গান হচ্ছে। এত কিছুর পরও কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হওয়া, কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমানো ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আম, কলা, আনারস, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, গাজর, ঢেড়শ, বেগুন, আলু, কচু ইত্যাদি অন্যতম যা আমাদের শরীরে পুষ্টি যোগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমগ্র বছর জুড়ে আমাদের দেশে এগুলো পাওয়া যায়। কিছু কিছু সরাসরি খাবার হিসেবে যেমন খাওয়া যায় আবার প্রক্রিয়াজাতকরণ করে খাবারের কাঁচামাল ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য বছর জুড়ে তৈরি করা যায়। যেমন: মচমচে চিপস আমাদের অন্যতম একটি প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্য যা বিভিন্ন ফল, সবজি ও কন্দাল ফসল থেকে তৈরি করা হয় এবং এর চাহিদা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাজা পণ্যের অর্থনীতির আকারের বিশালতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি আর্থসামাজিক ও বিপণন ব্যবস্থায়ও নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অতি ক্ষুদ্র থেকে বড় উদ্যোক্তা সকলেই একে বিপণনের অন্যতম একটি অংশ হিসেবে গণ্য করছে। এক সময় বাজারে একটি বা দুইটি চিপ্‌স পণ্য পাওয়া যেত এখন ৩৫ ধরণেরও অধিক চিপ্‌স ও ক্রেকার্স বিভিন্ন মোড়কে বিভিন্ন কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী পণ্য বাজারে বিপণন করছে। এ চিপ্‌স পণ্যের বাজারও দিন দিন বাড়ছে। সকলেই বিভিন্ন খাবারের সাথে মিলিয়ে বা রিফ্রেশমেন্ট হিসেবে যাতায়াত বা অফিস ও কর্মক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের খাবার হিসেবে ব্যবহার করছে। সকল বয়সের মানুষই এটি গ্রহণ করেছে। তম্মধ্যে শিশু ও অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের নিকট এটি যেমন জনপ্রিয় তেমনি অপরিহার্য হয়েছে। হোমমেড হিসেবে যেমন অনেক উদ্যোক্তা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিপণন বিতান, সভাস্থলসহ হিসেবে বিভিন্ন গণ জমায়েতে সাধারণত: সরাসরি তেলে ভেজে সরবরাহ করছে আবার বাসায় তৈরিকৃত চিপ্‌সপণ্য মোড়কজাত করে বিক্রয় করছে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন কাঁচা ফল বা সবজির টুকরোকে তেলে কিছুক্ষণ রেখে ফ্রাই করা যাতে পণ্যটি পুরো মচমচে হয়। এখানে পণ্যকে ভাজার জন্য তেলকে তাপ পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা খাবারের সরাসরি সংস্পর্শে আসে। প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণত: স্বল্প তেল ব্যবহার করা বা সম্পূর্ণ তেলের মধ্যে ডুবিয়ে বিভিন্ন কাঁচা খাদ্য দ্রব্য ভেজে খাওয়া হয়ে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রেই মানসম্মত হয় না। ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং একটি উন্নত পদ্ধতি যেখানে কম তাপমাত্রা ও চাপে ভাজা চিপ্‌স পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে এবং এটি স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ বিধায় বিভিন্ন ফল ও সবজির চিপ্‌স পণ্য তৈরিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সাধারণত: যে সকল ফল বা সবজিতে চিনির পরিমাণ অধিক থাকে সে সব পণ্য ১৫০ - ১৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তারও অধিক তাপমাত্রায় তেলে ভাজা হলে ভাজা পণ্য বাদামী বর্ণ ধারণ করে। গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে তেলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে ভাজা চিপ্‌স

পণ্যে মাত্রাতিরিক্ত কারসিনোজেনিক উপাদান এক্রাইলামাইড উৎপন্ন হয় যা মানব দেহে ক্যান্সার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহীত ভাজা আলুর চিপ্স এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করার পর দেখা যায়, আলু কেটে অত:পর রৌদ্রে শুকিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে তেলে ভাজলে মচমচে আলুর চিপ্সে ৫৬৩-১০১৮০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি এক্রালামইড পাওয়া যায় যা প্রতিদিন আমাদের শরীরের সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য মাত্রার ৩-৫০ গুণ বেশি (টিডিআই ২.৬ মাইক্রোগ্রাম/কেজি; একজন মানুষের গড় ওজন ৭০ কেজি হিসেবে ১৮২ মাইক্রোগ্রাম/কেজি)। উন্নত দেশে বাণিজ্যিকভাবে ফল ও সবজি থেকে চিপ্স তৈরিতে ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং মেশিন ব্যবহার করা হয় যা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমাতে যেমন সহায়তা করে তেমনি নিরাপদ ও গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে উৎকৃষ্টমানের মচমচে চিপ্স পণ্য তৈরিতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্ন্যাক্স শিল্পে ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং প্রযুক্তির ব্যবহার নিরাপদ ফ্রাইড পণ্য বিবেচনায় এখন সময়ের দাবি এবং এটির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একদিকে যেমন পরিবেশ বান্ধব অন্যদিকে নিরাপদ ও উচ্চমান সম্পন্ন ভাজা চিপ্স তৈরীতে একটি আর্দশ পদ্ধতি হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্ধারিত তাপমাত্রা ও নিদিষ্ট সময় অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের ফল ও সবজি যেমন: আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা, আলু, মিষ্টি আলু, গাজর, পেঁপে, মানকচু, কাসাভা ইত্যাদি থেকে বহুবিধ মচমচে চিপ্স পণ্য অনায়াসে প্রক্রিয়াজাত করা যায়। বিএআরআই এর পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বল্পমূল্যের ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং মেশিন ও ডি-ওয়েলিং মেশিন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার মচমচে চিপ্স পণ্য তৈরির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সহায়তা করবে। বিএআরআই উদ্ভাবিত মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে আলু স্লাইচ বা টুকরো সরাসরি শুকানো ছাড়াই ভাজা যায়, উৎকৃষ্ট রং ধারণ করে এবং সকল চিপ্স সমভাবে মচমচে হয়। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় যে, মচমচে ভাজা আলুর চিপ্সে এক্রালামডের পরিমাণ প্রায় ৭৪-৮১ মাইক্রোগ্রাম/কেজি যা এক জন মানুষের শরীরের ওজন অনুযায়ী সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য মাত্রার অর্ধেক পরিমাণ। উল্লেখ্য যে, বারি ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং যন্ত্রটির মূল্য আমদানীকৃত যন্ত্রের তুলনায় বহুলাংশে সাশ্রয়ী। এটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবহার উপযোগী বিধায় আকারে ছোট ও সহজেই যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত এবং অল্প জায়গায় স্থাপন করা যায়। যন্ত্রটি চালানোর পদ্ধতি অতি সহজতর, যে কেউ সহজেই এটি ব্যবহার বিভিন্ন ফল ও সবজি থেকে বিভিন্ন প্রকারের মচমচে চিপ্স তৈরির কাজে অতি সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। তৈরিকৃত যন্ত্রটি স্থানীয় যেকোন ওয়ার্কশপে তৈরী করা যাবে এবং অল্প খরচে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার ফল ও সবজি (কাঁঠাল,আনারস, আলু, পেঁপে, মানকচু, গাজর, আম, কাসাভা ইত্যাদি) হতে অনায়াসে গুণগত ও মানসম্পন্ন চিপ্স তৈরি করা যাবে। গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং মেশিন এর মাধ্যমে আলু, কলা, কাঁঠাল, গাজর, আনারস, আম, মানকচু থেকে চিপ্স তৈরিতে সাধারণত: ১০০-১৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন হয় এবং ৫ মিনিট থেকে ৫০ মিনিট পর্যন্ত তেলে ডুবিয়ে ভাজতে হয়। ফল বা সবজির টুকরো, পুরুত্ব ও কোষের ধরণের উপর ভিত্তি করে ফ্রাইং এর সময় নির্ধারণ করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে মচমচে চিপ্সের গায়ে তেল দেখতে পাওয়া যায় যা খাওয়ার সময় আমাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় আমরা টিস্যু পেপার, কাগজ বা অন্যকোন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে অতিরিক্ত চিপ্সের উপরিভাগের তেল মুছে বা বের করে নেওয়ার চেস্টা করি যা কখনই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। আবার প্রচলিত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত চিপ্সের সংস্পর্শে থাকা অতিরিক্ত তেল সংরক্ষণ সময় কমায় এবং কিছুদিন পরে প্যাকেটে রাখা চিপ্সে তেলের দুর্গন্ধ (ৎধহপরফ) তৈরি করে। গবেষণায় লক্ষ্য করা হয়, ফল বা সবজির টুকরো ভাঁজা পরে মচমচে চিপ্স ১-২ মিনিট ডি-ওয়েলিং করলে চিপ্স থেকে প্রায় ১০ ভাগ তেল নিষ্কাশন বা বের হয়ে আসে যা পুনরায় চিপ্স তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। ফয়েল প্যাকেটে মচমচে চিপ্স রেখে যথাযথভাবে নাইট্রোজেন ফ্রাশ করলে সংরক্ষণকৃত চিপ্স ৬ মাসের অধিক গুণগতমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা যায়। কাজেই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য এবং এ বিবেচনায় মুখরোচক খাদ্য পণ্য হিসেবে ফল ও সবজি দিয়ে তৈরিকৃত ভাজা চিপ্সকে নিরাপদ করাও সময়ের দাবি। সর্বোপরি ভাজা চিপসকে নিরাপদ ও পুষ্টিগুণ বজায় রেখে সর্বত্রই গ্রহণযোগ্য করতে ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার কোন বিকল্প নেই।

Concentration, source identification and potential human health risk assessment of heavy metals in chicken meat and egg in Bangladesh

Shamshad B. Quraishi
Mohammad Mozammal Hosen
AKM Atique Ullah

Analytical Chemistry Laboratory
Chemistry Division Atomic Energy Centre
Bangladesh Atomic Energy Commission

Introduction

Heavy metals have been classified into different groups including toxic (arsenic, cadmium, lead, mercury, chromium, nickel, etc.), probably essential (vanadium), and essential (copper, zinc, iron, manganese, selenium, and cobalt) metals. The non-biodegradable nature, long biological half-lives and the capability to be deposited in different body organs resulted from their high retention capacity has made the toxic metals most notorious .

Heavy metals have been reported to cause different carcinogenic, mutagenic, and teratogenic effects to human health. For instance, lead has been associated with poor cognitive development and intellectual capability in children, increased blood pressure and cardiovascular disease in adults. Cadmium causes kidney failure, reduced reproduction ability, hypertension, tumorous and hepatic dysfunction.

As an important source of many micronutrients such as iron, selenium, vitamins (e.g. A, B12, D), and folic acid which are either not present in plant-derived foods or have a poor bioavailability from them, chicken meat are often prescribed by doctors. Similar to meat, egg is also highly nutritious and mandatory for a healthy and balanced diet. Thus, both chicken meat and egg are important nutrient for our health and development. As a developing country with a huge number of people deprived of balanced nutrition, chicken meat and hen egg are very important foodstuffs to the people of Bangladesh.

There have been a very few studies on the levels of trace elements in Bangladeshi chicken meat and poultry egg. Moreover, there is no or very limited information on the heavy metal concentration in chicken meat and hen egg considering the variety of chicken and egg available in the country. Besides, the constantly rising anthropogenic and industrial pollutions stresses on the necessity of continuous monitoring of the presence of heavy metals in food samples. Thus, the objectives of the current study were set to measure the concentration of Pb, Cd, Cr, As, Hg, Mn, Fe and Zn in three most commonly consumed varieties of chicken meat and three varieties of hen egg in Bangladesh, identification of their probable sources, and assess the associated carcinogenic and non-carcinogenic risks from their intake.

Materials and methods

Sample Collection and preservation

A total of 72 fresh samples of chicken and hen egg were collected from four wholesale markets of Dhaka namely- Kawran Bazar, Mirpur-1, New Market, and Mohammadpur Bazar. The most common three categories of chicken such as broiler, local, and sonali and three categories of hen egg were targeted in the present study. Organic egg samples were collected from four major shopping malls; Shapna, Agora, Meena Bazaar, and G – mart. The chicken and eggs samples were stored at −20 °C & 4 C until analysis respectively.

Results and discussion

Concentrations of heavy metals in chicken meat and hen egg

The concentrations of Pb, Cd, Cr, As, Hg, Mn, Fe, and Zn were determined in three varieties of chicken meat (broiler, local, and sonali) and three varieties of hen egg (layer, local, and organic) collected from four wholesale markets of Dhaka. The mean, median, 1.5 IQR, 25th, and 75th percentiles values for the studied heavy metals were represented in Fig. 1.

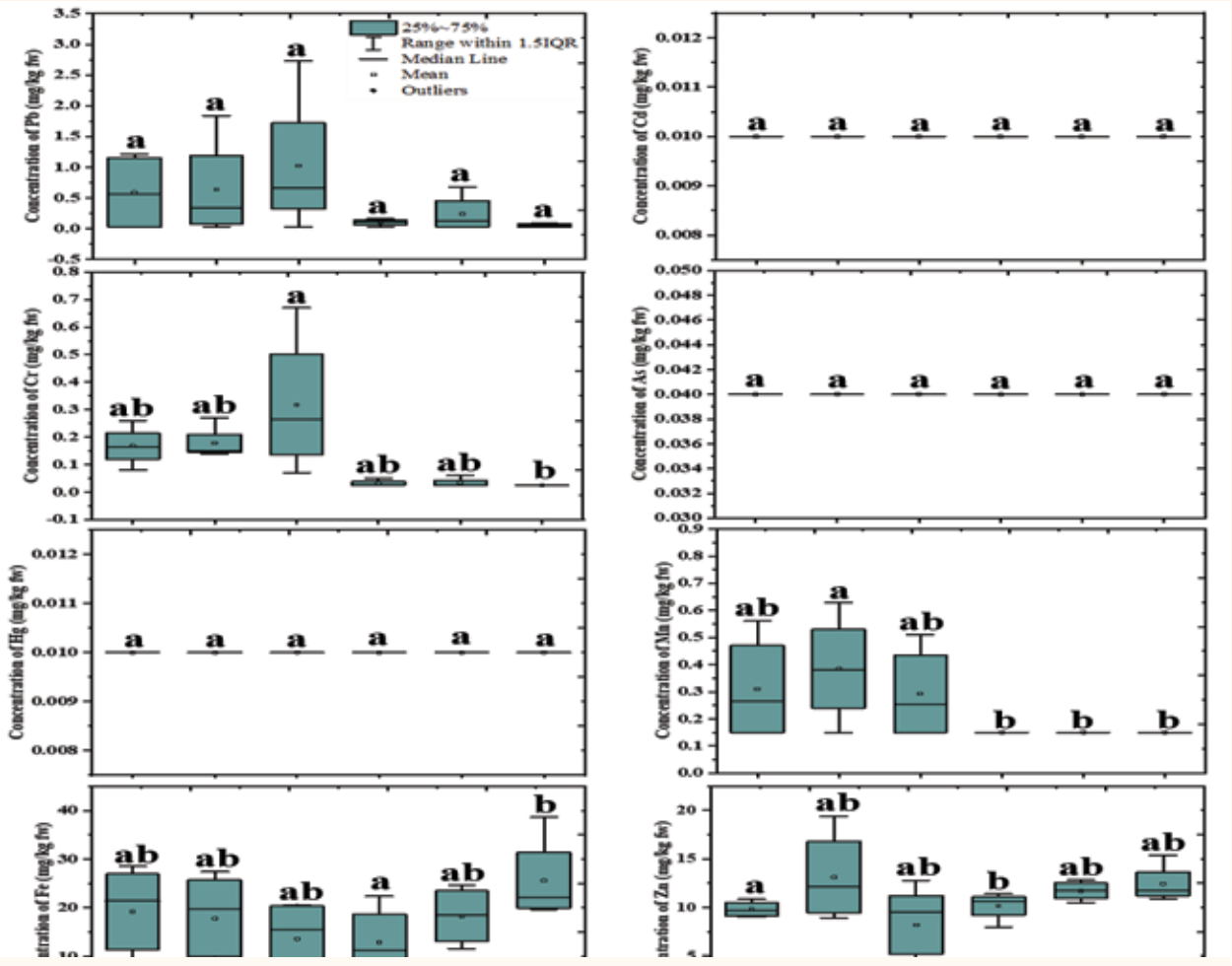

Fig. 1. Box-whisker representation indicating the distribution of heavy metals in chicken meat and hen egg collected from Dhaka, Bangladesh. Letters a and b indicate statistically significant difference at 0.05 level.

Multivariate statistical analysis

The Pearson correlation coefficient is a potential tool used to measure the strength of linear association between the pairs of variables by calculating a summary index. Hence, the metal to metal correlation data in terms of Pearson product moment correlation coefficients that were significant at 99% and 95% confidence level was evaluated and presented in Table 1. The pairs of Pb-Cr (0.862), Cd–As (1.000), Cd–Hg (1.000), As–Hg (1.000), and Fe–Zn (0.537) showed high and significant correlations at 99% confidence level. While Mn showed weak correlation with Fe (0.407) at 95% confidence level. The high correlations supported a hypothesis that the source of the metals might be analogous.

Table 1 Correlation between the heavy metals in chicken meat and egg samples.

	Pb	Cd	Cr	As	Hg	Mn	Fe	Zn
Pb	1							
Cd	.241	1						
Cr	.862**	.050	1					
As	.241	1.000**	.050	1				
Hg	.241	1.000**	.050	1.000**	1			
Mn	.277	-.124	.232	-.124	-.124	1		
Fe	-.182	-.302	-.222	-.302	-.302	.407*	1	
Zn	-.230	-.003	-.330	-.003	-.003	.194	.537**	1
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

The principal component analysis (PCA) using varimax-normalized rotation was subsequently carried out for factor loadings in each metal. The most important significance of the PCA is to reduce a large number of variables into a new set of reduced variables based on their mutual dependence (Manzoor et al., 2006). The significant number of PCs was identified using a scree plot (Fig. 2) in order to recognize the structure of the underlying parameters. The results showed that three eigen values greater than 1 explained more than 87% of the total variance (Fig. 2). A three-dimensional plot of the PCA loadings was illustrated in Fig. 2 (inset) and the relationships among the heavy metals were readily understood.

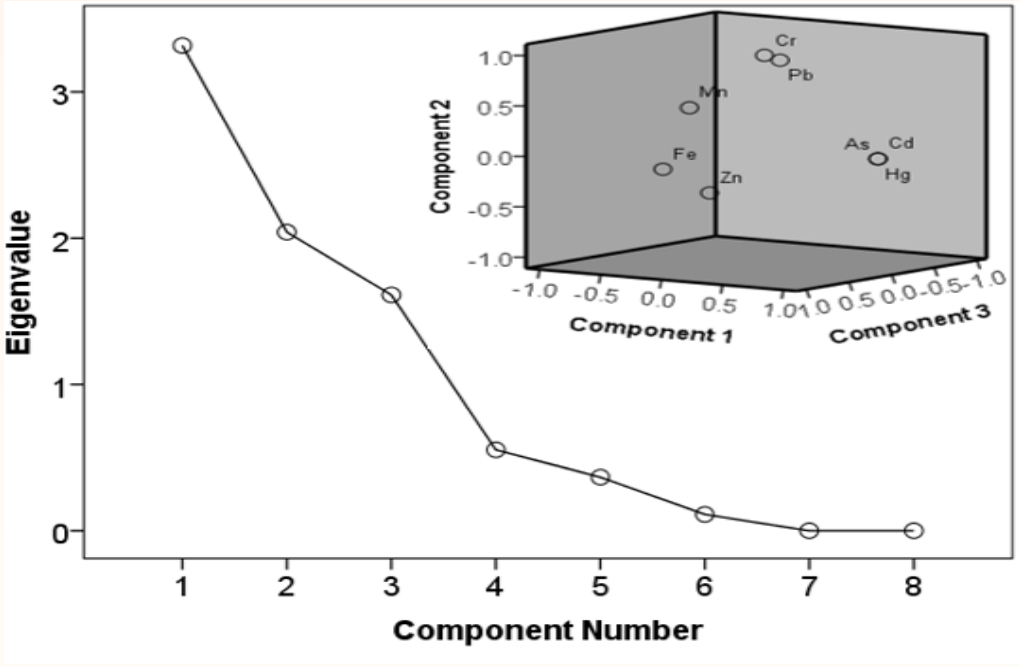

Fig. 2 Principal component analysis of heavy metals by scree plot of the characteristic roots (Eigen values) (inset shows the three-dimensional plot of the PCA loadings demonstrating the relationships among the heavy metals).

Human health risk assessment

Among the eight heavy metals (Pb, Cd, Cr, As, Hg, Mn, Fe, and Zn) analyzed in the present study, the concentrations of seven heavy metals except Pb in the tested chicken meat and hen egg samples did not exceed the legislative limits set by various countries/agencies. However, the exposure dose of chemical contaminants can affect the potentiality of toxicity. Thus, combining the estimated concentration of heavy metal in the foodstuffs was considered as a potential tool to evaluate the benefits to risk.

As a first attempt of evaluation of human health risk, daily dietary intake of each metal through the consumption of chicken meat and hen egg was estimated. The highest mean value of EDI was calculated for Fe (4.87E-03 mg/kg-bw/day) while the lowest mean value for Cd and Hg (2.89E-06 mg/kg-bw/day. The EDI results were compared with the respective maximum tolerable daily intake (MTDI) of individual heavy metal suggested by Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA) for Pb, Cd, Cr, As, and Hg and China National Standards (CNS) for Mn, Fe, and Zn. It is demonstrated that EDI values for all the analyzed heavy metals were below the respective MTDI levels indicating that it was unlikely to experience adverse health effects from exposure to the targeted heavy metals.

The non-carcinogenic risk of the selected heavy metals due to the consumption of chicken meat and hen egg was calculated based on target hazard quotient (THQ) and total target hazard quotient (TTHQ). The cumulative health risks by summing the health risks of eight investigated heavy metals was also evaluated as TTHQ. The mean value of TTHQ was found 0.0944 and 0.0302 for the consumption of chicken meat and hen egg, respectively. Both the THQ and TTHQ values did not exceed the threshold value of 1 (Fig. 3). The results indicated that the consumers would not experience any potential significant health risk during an entire lifetime. However, the present study demonstrated that only chicken consumption and hen egg consumption contributed about 10% and 3%, respectively to the threshold limit.

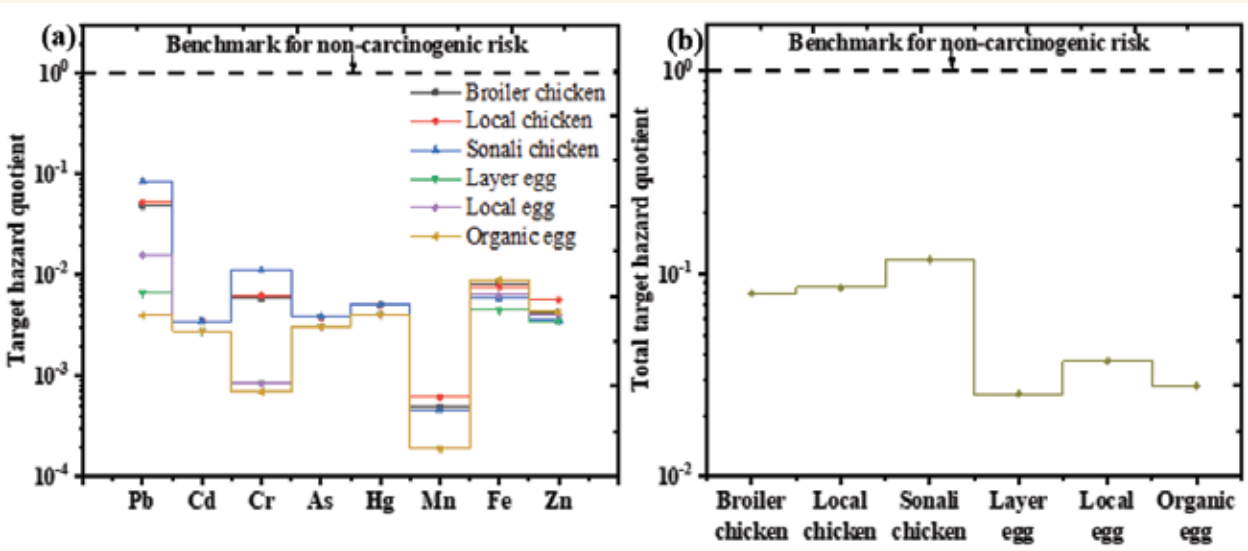

Fig. 3. Non-carcinogenic risks (a) target hazard quotient (THQ) and (b) total target hazard quotient (TTHQ) due to dietary intake of eight heavy metals through the consumption of chicken meat and hen egg.

The carcinogenic risks (CRs) derived due to the dietary intake of Pb, Cd, Cr, and As were calculated as these heavy metals may promote both non-carcinogenic and carcinogenic risk depending upon their exposure dose. The CRs of Pb, Cd, Cr, and As due to the consumption of chicken meat and hen egg were calculated. In the present study, the carcinogenic risk of Pb, Cd, Cr, and As due to the consumption of chicken meat and hen egg were negligible to acceptable range (Fig. 4). This result suggested that it was unlikely to experience any carcinogenic risk of Pb, Cd, Cr, and As due to the consumption of the studied foodstuffs.

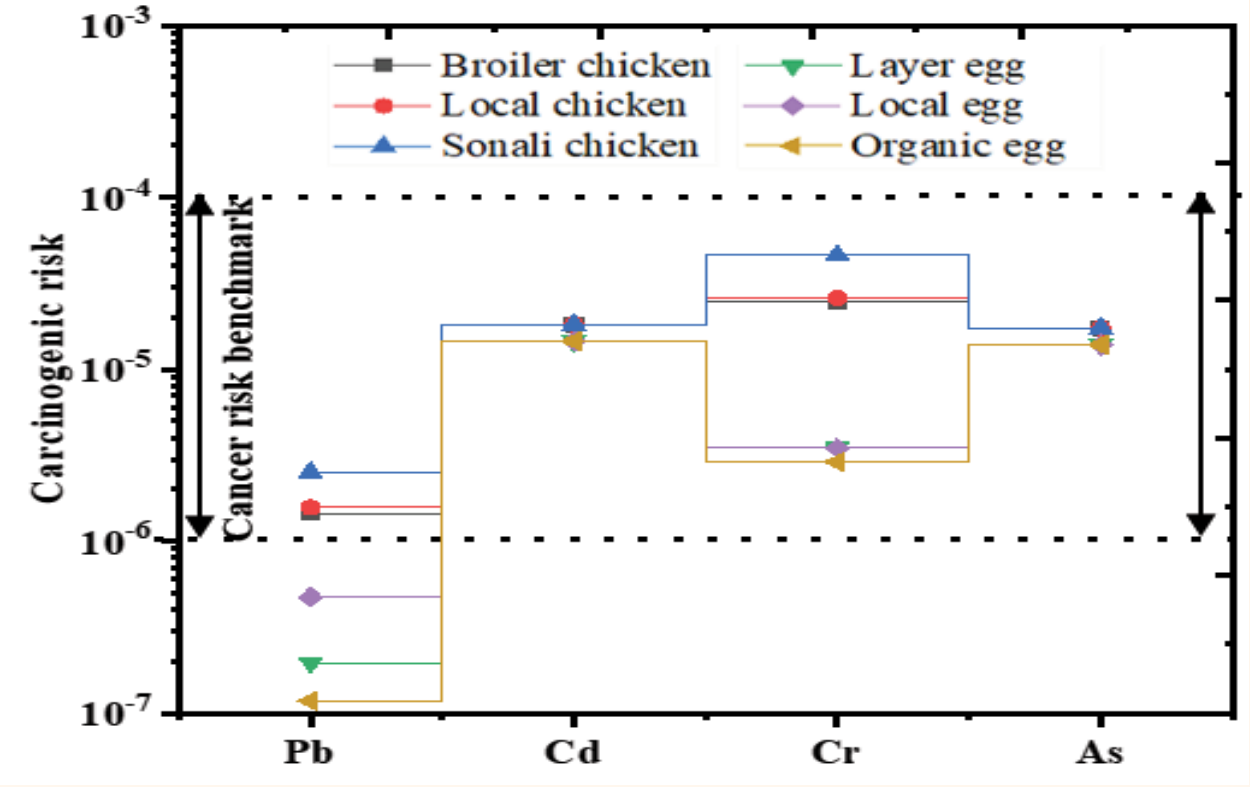

Fig. 4. Carcinogenic risks due to the dietary intake of carcinogenic heavy metals through the consumption of chicken meat and hen egg.

Conclusion

The concentrations of Pb, Cd, Cr, As, Hg, Mn, Fe, and Zn in three varieties of chicken meat and three varieties of hen egg samples collected from one of the mostly densely populated cities in the world, Dhaka, Bangladesh were determined and potential human health risk was assessed in terms of EDI, THQ, TTHQ, and CR. The metal concentrations were found below the maximum allowable concentration (MAC) in the foodstuffs except Pb in chicken meat. Pb concentration in chicken meat was found eight times higher than the MAC. However, the EDIs of heavy metals was below the maximum tolerable daily intake (MTDI). The calculated THQ and TTHQ values were less than 1 indicating the consumers would not experience any noncarcinogenic risk due to the consumption of the foodstuffs. The CRs of Pb, Cd, Cr, and As were within the acceptable range. The estimated human health risk assessment clearly revealed that chicken meat and hen egg could be a potential source of safe protein for the consumers with respect to heavy metals contamination. However, this study recommends that an attempt is required to estimate the organic contaminants and antibiotic residues in the foodstuffs in order to assess the collective health risk.

Acknowledgement: The authors gratefully acknowledge the technical staffs of Analytical Chemistry Laboratory, Atomic Energy Centre Dhaka, for assistance during the sample preparation and analysis.

FOOD SECURITY AND SAFETY FOR HEALTHY LIVES

Dr. Abu Hashem
Principal Scientific Officer and Head of the Division
National Institute of Biotechnology
(Ministry of Science and Technology)

Food is one of the basic necessities of life, and its importance is obvious and essential. Healthy food provides us the nutrients and energy to develop and grow, to be active and healthy, to move, play, work, think, and learn. Food contains nutrients—substances essential for the growth, repair, and maintenance of body tissues and for the regulation of vital processes. Food security means that there is enough food for the population and that people in that nation can get, pay for, and get enough food.

Bangladesh has achieved self-sufficiency in food. But we are still far behind in ensuring nutritional security and safe food. We can achieve this by providing nutritious food. For this, we have to be more focused on the production of food grains and animal meat. Along with nutritious food, safe food should be ensured. Only then can we stand up in the world as a healthy nation. For this, first of all, we have to think about what we are eating and how much is necessary for our health—how much nutrition or energy we will get from that food. Because these three words—food, health, and nutrition—are closely related to each other. Good health and a healthy mind require a nutritious and balanced diet every day. In order to meet the nutritional needs of the body, a person needs to choose a balanced diet and maintain the availability and nutritional value of the food. Apart from this, nutrition depends a lot on nutritional status, food production, the food distribution system, food habits, etc. A balanced diet consists of taking some food components, such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, mineral salts, and water, in moderate amounts according to the needs of the body. Carbohydrates provide energy and efficiency for the body. A lot of carbohydrates are found in rice, wheat, barley, potatoes, sweet potatoes, kachu, sugar, honey, jaggery, etc. Protein is the body's building and replenishing food. Fish, meat, milk, eggs, various pulses, beans, peas, etc. help in building the body. 4 kilocalories of energy are available from each gram of protein or carbohydrate. Fat keeps the body lean and keeps the skin nice and smooth. Soybean oil, mustard oil, sesame oil, ghee, butter, fatty fish, meat, eggs, and liver are fatty foods. 9 kilocalories of energy are available per gramme of fat.

Water protects the body from dehydration and maintains body balance. Drink at least 8–10 glasses of water a day. Apart from this, it is necessary to take food, such as various fruit juices and water. Fibre removes constipation from the body, controls weight, controls diabetes, and maintains intestinal health. Dietary fibre comes from plant foods. For example, flour, barley, corn, barley bran, beans, bean seeds, pulses, fruits with peels such as blackberries, grapes, guavas, apples, and pears, and all kinds of vegetables. Mineral salts such as phosphorus, iron, iodine, and zinc play a role in body composition, repair, nutrition, and physiological functions of the body. Iodine prevents goitre. Minerals remove iron anaemia and strengthen the structure of the hands and teeth. Zinc promotes mental and bone growth. Vitamin A, D, E, K, the Vitamin B complex, and C—all kinds of green and colourful vegetables, fruits, sour fruits, eggs, milk, liver, small fish, lemon tea, etc.—are rich in nutrients and disease prevention foods. Vitamin A prevents ringworms. Vitamin D prevents rickets. Vitamin "B" complex prevents various skin diseases.

It is important to know some things to make food safe. In addition to knowing these things, it is necessary to inform others. Particularly, those who help prepare or serve food should be aware of these issues. For food safety, the common instructions are: (1) Hand washing must be done while preparing, storing, and serving food. Wash your hands after work. Also, wash your hands before and after eating. Fingernails should be kept short so that food

particles or dirt will not accumulate under the nails; (2) food should be cooked well. Avoid eating half-cooked food; (3) always cover foods; (4) wash fruits and vegetables under running water before cutting or peeling; (5) if you want to marinate food, keep it in the refrigerator; (6) refrigerate perishable food within 2 hours (1 hour in warm weather) after cooking. It is better to divide into small containers when storing food in the refrigerator. It will cool the food quickly; (7) be careful when storing food in the refrigerator, keeping raw and cooked foods separate; (8) care must be taken to ensure that raw food and the liquid it secretes do not come into contact with anything else during shopping or when bringing it to the market; (9) wash cutting accessories (knives, chopsticks, chopping boards, etc.) and the cutting area thoroughly with mild soap and water after each use (for each food item); (10) for foods that can be eaten raw (such as fruit) and those that cannot (such as meat), it is best to use separate containers.

Figure: Following four simple steps at home can help protect against food poisoning.

(11) Cooked food should not be stored in containers previously used for raw meat or eggs. (12) You may use a microwave oven, the normal section of the fridge, or cold water to thaw frozen food in the deep freezer. (13) To understand whether the food is good or not, it cannot be put in the mouth, nor can the smell of the food be taken; (14) materials that have expired cannot be used; and (15) open food outside should not be eaten.

Another alarming concern is food adulteration. Although the government has taken various measures to ensure a safe food supply for the people, the supply of adulterated and substandard products in the market is not decreasing. In fact, just as those involved in the production process need to be aware and responsible, consumers also need to be aware and responsible. “The Food Safety Act, 2013” was enacted to ensure safe food free from adulteration and contamination in the country, and the Bangladesh Safe Food Authority was established in 2015. Despite the ongoing campaign against adulterated and contaminated food in the country, the issue of adulteration events across the country is alarming. Unfortunately, almost every food item in the country is tainted. Every year, a large number of people in the country suffer from various complex diseases, including cancer, due to adulterated food. The question is, why is the violence of food adulterers not decreasing after so many raids?

Conventional baby food is not only contaminated, but life-saving medicines are also contaminated. Consumers are being cheated by buying these adulterated and substandard products. Along with that, the health risk is increasing. In fact, although adulterated and harmful food is sold freely, no one can stand against the dishonest syndicate traders as there is no strong organisation of buyers in the country. Due to the condition of the market, many health-conscious people have stopped buying fruits. Various measures are taken during artificial ripening and to protect the fruit from rapid rotting, which can pose a serious threat to health. Market surveillance activities should be given more importance in protecting consumer rights and interests. It is necessary to bring down the rate of adulteration and fraud to zero through maximum enforcement of the law.

পোল্ট্রির মাংসে ক্ষতিকর স্বাস্থ্যগত প্রভাব নির্ণয়ে পরীক্ষাসমূহ

ড. সাবিহা সুলতানা
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারন মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষম পুষ্টি নিশ্চিতকরণে প্রাণিজ আমিষের ভূমিকা অপরিহার্য। বিগত কয়েক বছরে রেড মিটের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণে পোল্ট্রির মাংস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পোল্ট্রি বলতে কতগুলো গৃহপালিত পাখি প্রজাতিকে বোঝায়, যা মানুষ লালন-পালন করে মূলত এর মাংস খাওয়ার জন্য। পোল্ট্রির মাংসে প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, মিনারেল ছাড়াও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় এন্টিঅক্সিডেন্ট, বিভিন্ন জৈব সক্রিয় (Bioactive) উপাদান রয়েছে। সস্তায় প্রোটিনের উৎস হিসেবে পোল্ট্রির মাংস খুব জনপ্রিয় হলেও এটি নিয়ে রয়েছে নানান উদ্যেগ ও শঙ্কা। মাংস প্রোটিনসহ অন্যান্য পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ হওয়ায় খুব দ্রুত পঁচনশীল হয়। পোল্ট্রি প্রজাতি উৎপাদন হতে জবাই হয়ে খাবার টেবিলে পৌছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে মাংস দূষণের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত হয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধির মাধমে স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক সময় পশু-পাখি জবাই এর সময় সঠিক স্থান ও কৌশল মেনে চলা হয় না। আবার কসাইখানার চত্বর এবং বিভিন্ন পশু যেমন কুকুর, ইদুঁর, অন্যান্য পোকামাকড়সহ জবাইয়ের উপকরন হতে মাংস ও মাংসের উপজাত দূষিত হয় বা ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। এছাড়া, জবাই পরবর্তী মাংস অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রসেসিং (Improper handling) এর ফলে খাদ্যজনিত বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই, বৈজ্ঞানিব পদ্ধতি ও মাননিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে উৎপাদন থেকে খাবার পাত্র বা খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরুপণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা জরুরী। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে মাংসের গুনাগুণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।

১. মাংসের প্রক্সিমেট উপাদান নিরুপণঃ

প্রক্সিমেট কম্পোজিশন বলতে সাধারণত পুষ্টির পাঁচটি মৌলিক উপাদান যেমনঃ পানি/আর্দ্রতা, প্রোটিন, লিপিড, কার্বহাইড্রেট এবং এ্যাশ এর শতকরা পরিমান বোঝায়। উল্লেখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মাংসের পুষ্টি ও গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়। সাধারণত মাংসের নমুনায় আর্দ্রতা ৭৩.৭%-৭৫.৮%, প্রোটিন ২২.০%-২২.৯% এবং ছাই ১.০৪%-১.৭৪% থাকে।

২. লিপিড পার অক্সিডেশন টেস্টঃ

এটি মাংস ও মাংসজাত পণ্যের গুণগতমান অবনতির একটি প্রাথমিক কারণ। ফ্রি র‍্যাডিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন এর ফলে মাংসে লিপিড পার অক্সিডেশন হয় এবং রিএকটিভ অক্সিজেন যেমন হাইড্রক্সিল রেডিকেল এবং হাইড্রোপেরক্সিল র‍্যাডিক্যাল এই চেইন রিআকশনের প্রধান সূচনাকারী পেশী বা মাসল টিস্যুতে বিভিন্ন উপাদান যেমন মায়োগ্লোবিন (Mb), হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (H_2O_2), এবং অ্যাসকরবিক এসিড লিপিড পার অক্সিডেশনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। মাংসের পলিআনস্যাটুরেটেড ফ্যাটি এসিড এই ফ্রি র‍্যাডিক্যাল আক্রমনে খুবই সংবেদনশীল। এই অক্সিডেশনের কারনেই মাংস দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে এর গুণগত মানের অবনতি ঘটে। মূলত লিপিড পার অক্সিডেশন দিয়ে মাংসের ম্যালনডিঅ্যালডিহাইডের মাত্রা জানা যায়। থায়োবার্বিটিউরিক এসিড রিএকটিভ সাবসট্যানসেস (TBARS) এর মাধ্যমে মাংসে বিদ্যমান ম্যালনডিঅ্যালডিহাইড নিরূপন করে এর পঁচনের হার জানা যায়।

৩. লিপিড প্রফাইল এনালাইসিসঃ

এই টেস্টের মাধ্যমে মাংসে বিদ্যমান ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরলের পরিমান নিরূপন করা যায়। এই পরিক্ষার মাধ্যমে রক্তের লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল (LDL) এর পরিমান পরিমাপ করা যায়। এলডিএল (LDL) কোলেস্টেরল কে খারাপ কলেস্টেরল বলা হয় কারণ এগুলো ধমনীকে ব্লক করে এবং হৃদরোগের ঝুকি বাড়ায়, অন্যদিকে HDL (হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন) কোলেস্টেরলকে বলা হয় ভালো কোলেস্টেরল এবং শরীরে এর অনেক পুষ্টিগত সুবিধা (Nutritional benefit) রয়েছে। কারণ HDL কোলেস্টেরলকে লিভারে নিয়ে যায়। ফলে রক্তের সাথে মিশে এটি ধমনীতে যায় না, অন্যদিকে LDL সরাসরি ধমনীতে কোলেস্টেরল নিয়ে যায়। তাই LDL এর মাত্রা জেনে শরীরের উপর এর ঝুকি নির্ণয় করা হয়।

৪. হেভি মেটাল এনালাইসিসঃ

কিছু ধাতু মানব শরীরের জন্য অপরিহার্য যেমন জিংক (Zn), নিকেল (Ni), কোবাল্ট (Co), আয়রন (Fe), কপার (Cu), এবং কিছু ধাতু অপ্রয়োজনীয় যেমন লেড (Pb), মারকারী (Hg), আর্সেনিক (As), ক্যাডমিয়াম (Cd) ইত্যাদি। অপরিহার্য ধাতুগুলোর স্বল্পতায় শরীরের জৈবিক কার্যকলাপ বাধাগ্রস্থ হয় কিন্তু এর উপস্থিতি যখন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়, তখন তা শরীরের জন্য বিষাক্ত (Toxic) হয়ে উঠে। এই ধাতুগুলোকে হেভি মেটাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যা মাংসের গুণগতমানকে দূষিত (Contaminate) করে। তাই, শরীরে ভারী ধাতু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এবং ফুসফুস, কিডনী, কলিজা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আক্রান্ত হয়, রক্ত চলাচল ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং স্নায়ুবিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

৫. মাইক্রোবায়োলজিকাল এনালাইসিসঃ

মুরগির চামড়া বা মল মাংসের সাথে মিশে বিভিন্ন দূষিত জীবানু ছড়িয়ে পড়তে পারে। মুরগি জবাই বা প্রক্রিয়া করণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ থেকে প্যাথোজেনিক অনুজীব দ্বারাও দূষিত হতে পারে। মুরগির কাঁচা মাংসে বিভিন্ন ক্ষতিকর অণুজীব যেমন ই-কোলাই (E. coli), সালমোনেলা (Salmonella), ক্যাম্পাইলোব্যাকটার (Campylobacter) এবং ক্লোস্টিডিয়াম পারফ্রিনজেন (Clostridium perfringens) ব্যাকটেরিয়া থাকে। মাংস যদি কাঁচা বা কম রান্না করা হয় তাহলে খাদ্যজনিত রোগ যেমন ফুড পয়জনিং এ আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে। তাই ল্যাবরেটরীতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অনুজীবের উপস্থিতি নির্ণয় করা প্রয়োজন।

৬. এন্টিবায়েটিক রেসিডিউ নিরুপণঃ

বর্তমানে পোল্ট্রির মাংসের প্রতি ভোক্তার মনে এক ধরনের ভীতি দেখা দিয়েছে। অনেকে উদ্বিগ্ন থাকে যে পোল্ট্রি উৎপাদনে প্রচুর এন্টিবায়েটিক ব্যবহৃত হয়। তাই, পোল্ট্রির মাংসের গুনাগুণ ও এন্টিবায়েটিক রেসিডিউ নিরুপণ করা প্রয়োজন। খাদ্য শৃঙ্খলে যদি অতিরিক্ত এন্টিবায়েটিক ব্যবহার করা হয় তাহলে শরীরে কিছু রেসিসট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। পরবর্তীতে যারা এই মাংসগুলো খাবে তাদের শরীরে এই রেসিসট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করবে ফলে ঐ নির্দিষ্ট এন্টিবায়টিক দ্বারা চিকিৎসায় সাড়া দেবে না। তাই এটা নিয়ে অনেক মানুষের মধ্যে ভীতি কাজ করে। কিন্তু Withdrawal period মেনে চললে এটা হতে অনেকাংশ নিরাপদ থাকা যাবে। Withdrawal period বা প্রত্যাহারের সময়কাল বলতে ওষুধের শেষ ডোজ এবং খাদ্যের জন্য মাংস বা অন্যান্য মাংসজাত পণ্য উৎপাদনের সর্বনিম্ন সময়কে বোঝায়। বিভিন্ন এন্টিবায়েটি বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়, এদের Withdrawal period ও বিভিন্ন। এটা ২ হতে ১৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে। আবার কিছু ক্ষেত্রে রান্না করলে বা তাপ প্রয়োগ করলে অবশিষ্ঠ রেসিডিউ মাংস থাকে না ফলে তা শরীরের জন্য নিরাপদ হয়।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা মাংসের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে সহজেই নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি উত্তম চর্চার মাধ্যমে ভোক্তার জন্য নিরাপদ মাংস নিশ্চিত করা যাবে।

বাসাবাড়িতে মাংস রান্না করার সময় করণীয় কিছু সুরক্ষা টিপসঃ

মুরগির কাঁচা মাংস নিরাপদে সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এক সপ্তাহ পর্যন্ত আবহাওয়াভেদে মাংস রান্না করে বা ফ্রিজে রেখে খাওয়া যায়। ড্রেসড মাংস কেনার সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ বা ছেড়া প্যাকেটে সংরক্ষিত কিনা নিশ্চিত হতে হবে। কাঁচা মাংস নিরাপদ প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখতে হবে যেন মাংসের রস অন্যান্য খাবারকে দূষিত করদত না পারে। মাংস সংরক্ষণের সময় নিরাপদে মোড়ানো মাংসের ড্রয়ারে বা রেফ্রিজারেটরের সবচেয়ে ঠান্ডা অংশে রাখতে হবে। দুই দিনের মধ্যে মাংস রান্না বা হিমায়িত করতে হবে। ব্যবহারের ঠিক আগ পর্যন্ত মাংস প্যাকেটে রাখতে হবে। যদি দুই মাসের বেশী সময় ধরে ফ্রিজিং করা হয়, তাহলে বায়ুরোধী হেভি ডিউটি ফয়েল দিয়ে মুড়িয়ে ফেলতে হবে। রেফ্রিজারেটর হতে মাংস গলানোর সময় নিশ্চিত করতে হবে গলানোর রস অন্যান্য খাবারের সাথে মিশে না যায়। নিরাপদে খাদ্য প্রস্তুতির জন্য পৃথক কাটিং বোর্ড ব্যবহার করা উচিত। কাঁচা মাংসের সংস্পর্শে আসার পরে রান্নার সমস্ত পাত্র পরিষ্কার করা উচিত। খাবার পরিবেশনের সময় বিভিন্ন পাত্র পরিবেশন করা উচিত। ১ কোয়ার্টার পানিতে ১ চামচ ক্লোরিন ব্লিচের দ্রবণে ডুবিয়ে কাটিং বোর্ডগুলো স্যানিটাইজ করা যায়। রান্নঘরের তোয়ালে ও কাপড় সাবান, গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। রেফ্রিজারেটরে রান্না অথবা মেরিনেট মাংস ঢেকে রাখতে হবে অথবা রান্নার অন্যান্য উপকরণ হতে আলাদাভাবে রাখতে হবে। তাহলে জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে না, রান্না হবে নিরাপদ।

সর্বপরি, নিরাপদ মাংস উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে দেশব্যাপি পোল্ট্রি প্রসেসিং সেন্টার, রোগ নিরাময় কেন্দ্র, মান নিয়ন্ত্রন গবেষণাগার ও আধুনিক কসাইখানা স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া, মাংস নিরাপদ করতে পোল্ট্রি পালন থেকে বাজারজাত করনের প্রতিটি ধাপে কর্তৃপক্ষের নিয়মিত নজরদারীর পাশাপাশি ভোক্তাদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

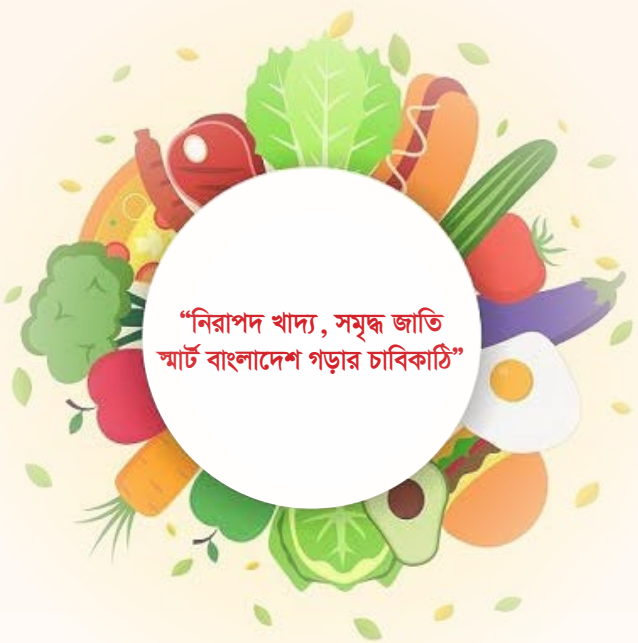

ASPECT OF NUTRACEUTICALLY ENRICHED RICE BASED BAKERY FOOD PRODUCTS IN BANGLADESH

Dr. Muhammad Ali Siddiquee
Chief Scientific Officer and Head Grain Quality
Nutrition Division, BRRI

Rice is the synonym for food in people residing in Ganga-Meghna-Brahmaputra basin area and has been one of the major traditional sources of carbohydrates and proteins since the prehistoric days. By the end of 2022, One hundred and nine high yielding varieties (HYVs), including both inbreeds and hybrids, have been released by Bangladesh Rice Research Institute (BRRI). At present, total rice production (cleaned/milled/white/polished rice basis) is about 34.8 MT, enough to satisfy the domestic requirement to feed more than 160 million people with the surplus of 2.06 MT. In contrast, there has been comparatively less progress on addressing the quality aspects of rice. Thus, emphasis should now be to focus on the grain quality and nutrition research towards rice grain nutraceutical properties to reveal its aptitude to combat with non-communicable diseases (NCDs) such as heart disease, cancer, diabetics etc. By the course of time, Grain Quality and Nutrition (GQN) Division of BRRI has identified some promising nutraceutically enriched HYVs such as black rice, antioxidant enriched rice, low glycemic index rice, anti-depressive alias gamma amino butyric acid (GABA) enriched pre-germinated brown rice and micronutrient enriched rice, specially zinc enriched rice. Since in Bangladesh, rice based processed food items are available namely flattened, popped and puffed rice to meet local demand as traditional food items, we assume that there is a potential scope to enhance nutraceutical enriched rice based food considering malnutrition mitigation and humanitarian relief operation into account.

In this study we have formulated energy dense nutraceutically enriched rice based food formulation specially cake and biscuits having energy density ranging from 5.0-5.5 100^{-1} g serving respectively. Rice based balanced and nutritious food intake may possibly reduce the amount to unprocessed whole rice consumption gradually. By attaining required dietary allowance (RDA), rice based food may help sustain food security in Bangladesh in a way to properly and effectively utilizing the rice grain. It will open diversified uses of rice and rice based food products in Bangladesh. In GQN Division, BRRI, we have formulated energy dense rice biscuit (EDRB) and energy dense rice cake (EDRC) at ED 5.6 and 5.0 respectively. Earlier in 2015, Shozib, et al, reported few rice based food items such as rice ball (393 Calories 100^{-1}g serving; ED3.93) rice biscuit (479 Calories 100^{-1}g serving; ED 4.79), rice plan cake (465 Calories 100^{1}g serving; ED 4.65) in an approach to create multiple options for diversified use of rice grain in Bangladesh. Since rice flour does not have gluten protein unlike wheat, so making dough seems difficult to get appropriate texture in reality. We tried several natural products to optimize its shape and texture such as sagu, a well-known lubricating agent, and dates; it enhances chewing properties rather than using xanthan gum (commercially available bacterial lyophilized).

A major factor constraining accessibility of poor is price volatility. As the poor spend a relatively larger proportion of their income in basic stables, a sudden spike in price is equivalent to reduction in their real incomes. This will constrain their ability to acquire adequate quantity of staples. Considering this fact into account, our formulated products will not cost more than $0.10 USD for 100g serving which supposed to be cost effective. Rice-based formulated diets for children with moderate to acute malnutrition must have some important characteristics including high content of micronutrients, especially growth nutrients, high energy density, adequate high protein and fat content, low content of anti-nutrients, low risk of contamination, acceptable taste and texture, culturally acceptable, easy to

prepare, affordable and available, High energy density rice is most desirable for children with wasting, as they have an increased energy need for catch-up growth.

Low cost, nutritious and balanced rice based food items can be distributed in emergency situations such as flood relief program, earth quake disaster management, war engaged solders, refugee and social welfare related works, such as improving health status of malnourished street children and climate change migrated population in Bangladesh. In the adverse situations, usually people suffer from inadequate intake of staples, and unavailability of fuel and cooking facilities. Hence, government as well as nongovernment organizations (GOs & NGOs) can distribute energy dense rice based dry foods, such as EDRC and EDRB to targeted population to provide preliminary boost up feeding.

Since these products are both fat (>25%) and protein (>10%) enriched, we expect that these special products will soon be adopted in people's meal where adverse situations will arise. Since WFP has a successful integration of dry food products like wheat-based HEB to provide food supplements under emergency situations, rice-based products such as EDRB and EDRC may also have great potential under similar situations in Bangladesh. EDRB and EDRC HEBs formulated by GQN Division, BRRI, Bangladesh. As per the recent estimates by HIES-BBS, 2016, current per capita rice consumption (g capita^{-1} day^{-1} in Bangladesh is 367g which is still above the desirable intake of 350 g capita^{-1} day^{-1}. Hence a total of 367g cooked rice might generate around 477 calories but in the contrary, the new rice-based food formulation products might utilize only 30-35g of rice flour which eventually reduces rice uses by 10 times but still getting similar amount of energy through EDRC and EDRB generating 500 and 550 Kcal, respectively. Rice is the most appreciated cereal crop to combat NCDs with its versatile nutraceutical properties embedded in it. In this study, we demonstrated that the formulation of nutraceutically enriched rice-based food items have potential to be popular among Bangladeshi people. This will pay a vital role to gradually reduce overall rice consumption and preferably help sustain food security in Bangladesh in a way to properly utilizing the rice keeping the required dietary allowance intact. In addition, nutraceutical rice-based food formulation for specific NCDs has potential for success in non-communicable disease management in Bangladesh.

শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মানোন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তরের ভুমিকা

ড. মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তর এর অবদান উল্লেখযোগ্য। আমাদের জাতীয় জিডিপি'র শতকরা ৩.৫২ ভাগ ও কৃষিজ জিডিপি'র এক চতুর্থাংশের বেশি (প্রায় ২৬.৩৭ ভাগ) মৎস্য সেক্টরের অবদান। প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য শিল্পের মধ্যে শুটকি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। শুটকি হল মাছ প্রক্রিয়াকরণের প্রাচীনতম একটি পদ্ধতি যেখানে প্রাকৃতিক আলো ও বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে মাছ থেকে আর্দ্রতা অপসারণ করে সহজে মাছকে সংরক্ষণ করা যায়। এটি অণুজীবের বৃদ্ধিকে বাধা দেয় এবং পচে যাওয়া রোধ করে। শুটকি মাছ তাজা মাছের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিডের উপকারিতা ধরে রাখে। এছাড়াও এটি স্বাস্থ্যকর প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস; প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনো মাছে ৮০-৮৫ শতাংশ প্রোটিন থাকে। এটি শুধুমাত্র প্রোটিন সমৃদ্ধ নয়, শুটকি মাছের প্রোটিনের গুণমানও উন্নত। শুধু তাই নয়, এতে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় মিনারেল এবং ভিটামিন, যা শরীরের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। শুটকি মাছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ ও খুবই কম। তাই স্বাস্থ্যকর ও বিশেষ স্বাদ-গন্ধময় খাবার হিসেবে দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে শুটকি মাছের বিশেষ চাহিদা থাকলেও প্রচলিত উপায়ে তৈরি শুটকির গুনগতমান ও খাদ্য নিরাপদতার প্রশ্নে বাংলাদেশের শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পটির এখানো আশানরূপ বিকাশ হয়নি।

শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা:

শুটকি মাছ পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। উপকূলীয় কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার নাজিরারটেক, মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ও সোনাদিয়া, টেকনাফ, শামলাপুর, পেকুয়া উপজেলার সুন্দরীপাড়া, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও কুতুবদিয়া উপজেলার বারো ঘোপ, বাগেরহাট জেলার দুবলারচর, ভোলার চরফ্যাশন, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, আলীপুর ও মহিপুর এলাকায় দেশের সবচেয়ে বড় শুটকির আড়ত রয়েছে। শুটকি প্রক্রিয়াকরণ পেশায় জড়িত মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়িদের পর্যাপ্ত কারিগরি, হাইজিন-স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে শুটকিতে উচ্চ মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহার, পোকার আক্রমণ, পণ্যের মোড়কজাত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথ বিধি না মানা ও দূষিত পানি ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে উৎপাদিত শুটকি পণ্যের মান ও স্বাস্থ্যঝুঁকি এ শিল্পের উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে শুটকি প্রক্রিয়াকরণে টাটকা মাছ ব্যবহার, হাইজিন-স্যানিটেশন নিশ্চিকরণ, উচু ও আবৃত মাচায় শুটানো এবং উন্নত মোড়কজাত পদ্ধতি ব্যবহার করে শুটকি মাছের গুনগত মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপদতা বিধান করে শুটকি পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার প্রসার এবং এ সেক্টরে জড়িতদের জীবন মানের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

নিরাপদ ও মানসম্মত শুটকি উৎপাদন ও সরবরাহে মৎস্য অধিদপ্তরের পদক্ষেপসমূহ:

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের মৎস্য খাতে ফুড সেফটি বিধানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মৎস্যের উৎপাদন হতে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি পর্যন্ত সকল ধাপে কার্যকর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি আরোপের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের খাদ্য নিরাপত্তা ও গুণগতমান নিশ্চিত করে ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধানে ও মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। কীটনাশক মুক্ত ও গুণগত মানের শুটকি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর

কর্তৃক শুটকিতে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ (রেসিডিউ মনিটরিং) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নিরাপদতা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ প্রণয়ন ও কার্যকর করেছে। উক্ত আইনের ধারা ৩০ অনুসারে- কোন ব্যক্তি মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বা অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করিবার জন্য উহাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ (ফরমালিন, কীটনাশক বা অন্য কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ) ব্যবহার করলে অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের, কিন্তু (পাঁচ) বছরের নিম্নে নহে, কারাদন্ড অথবা অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড এর বিধান রয়েছে। বর্ণিত আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিকরণার্থে স্থাপনা পরিদর্শন, ভ্যালু-চেইন মনিটরিং ও রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার প্রসারে অবদান রাখছে।

এছাড়া, নিরাপদ ও মানসম্মত শুটকি উৎপাদন ও বিপনন প্রসারের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থ (FAO) এর কারিগরি ও আর্থক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় বিশেষভাবে কীটনাশক দুষন রোধের লক্ষ্যে বিশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে । প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলো হলো -

- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য যেমন শুটকি মাছে কীটনাশক এর দূষন মনিটরিং জোরদার করার জন্য মৎস্যপণ্য ও পরিবেশগত ম্যাট্রিক্সে হতে Persistent Organic Pollutants এবং অন্যান্য কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি পরীক্ষা করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরাধীন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও এনালিস্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- শুটকি পণ্যে কীটনাশকের অবৈধ ব্যবহার বা অনিচ্ছাকৃত দুষণের কারণ বা উৎস্য উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে জরিপ পরিচালিত হয়েছে।
- কীটনাশক বা ক্ষতিকর রাসায়নিকমুক্ত শুটকি প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
- নিরাপদ শুটকি উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে সম্প্রসারণ।

শুটকি সেক্টরের মান উন্নয়নে করনীয়:

- শুটকি প্রক্রিয়াকরণ তথা কৃষি সেক্টরে কীটনাশকের অবৈধ ব্যবহার রোধকল্পে কীটনাশকের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করা যাতে কীটনাশক ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মাধ্যমে এর সহজপ্রাপ্যতা রোধ করা যায়।
- শুটকি উৎপাদন ও বিপনন পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও টেকনোলজি প্রদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করা।
- সঠিক প্যাকেজিং এবং ভ্যালু চেইন এর উন্নয়নের মাধ্যমে শুটকি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার প্রসার করা।
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ এর আওতায় শুটকি ভ্যালু চেইন স্থাপনায় পরিদর্শন ও মনিটরিং জোরদার করা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রয়োজনীয় ভৌত-অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা গড়ে তোলা।
- শুটকি পণ্যের মানোন্নয়ন ও রপ্তানি প্রসারে এ সেক্টরে জড়িতদের বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি।

PREVENTIVE FOOD CONTROL SYSTEM: HOW WE CAN ADDRESS?

Md. Masud Alam
Senior Food Safety Consultant
JICA STIRC Project

We all are food safety experts in Bangladesh to some degree because we all have some common experiences of food and drinks. This experience is whether about legal or regulatory or simply our daily meals and snacks, we all have fought for fraud labeling or unclear labeling and met at least a mild food poisoning. We have all certain level of expectations about what our food should be like organic, local, imported, non-GMO or any range. We are very much interested in news of food safety outbreaks or instances of heavy metal, pesticides and veterinary drugs such as, pesticides residues in brinjal and antibiotics in milk.

Mostly everyone in modern society depends on someone else who grows or makes the vast majority of the food we eat. In widest meaning, food law is set to protect its citizens from unhygienic and unsafe food. Since food chain may be small, medium and long, it requires proactive and systematic approach emphasizing preventive approach to control food safety issues because only end-product testing and/or inspection through reactive approach cannot remove the sources of issues. Preventive controls approach has been universally accepted and adopted throughout the globe because it helps to identify the most important areas to prevent food safety issues rather than reacting to problems after arising. Preventive control programs are designed to work in connection with and supported by other relevant programs such as Good Manufacturing Practices (GMPs), Good Hygienic Practices (GHP), Good Agricultural Practices (GAP) and Good Distribution Practices as the foundation for food safety management. Application of preventive controls approach in identified steps helps to minimize the risk of producing products that can do foodborne diseases to consumers!

History of preventing control started with Risk-based approaches to managing food safety as a very first initiative in 1960s during development of food for the U.S. space program. Finished-product testing was the control measure of quality control programs during this time that resulted in shortage of food for space flights. This was commercially impractical. As a result, NASA then worked with Pillsbury company to preventing hazards through product formulation and process control in a risk assessment and management manner. This concept is called as Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Based on their experiences, Pillsbury company organized training program for the US FDA inspector on that time.

US FDA initiated HACCP principles in the development of low acid canned food regulations in 1970s. The U.S. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF) and the Codex Alimentarius Commission (Codex) published HACCP principles in the 1990s. FDA has HACCP regulations for seafood and juice products; USDA has HACCP regulations for meat and poultry products; and HACCP is endorsed by many countries, including Australia, Canada, New Zealand and European Union countries.

However, the preventive controls approach includes not only CPPs in HACCP, but also controls for hazards related to food allergens, GMPs, sanitation, suppliers and others for example, food recalls and withdrawal, customs and boarder requirements, licensing and registration of food establishments as regulatory compliance. US FDA has started this Preventive control approach for food and feed like Food Safety Preventive Control for Human Food (FSPCA for Human Food) and Food Safety Preventive Control for Animal Feed (FSPCA for Animal Feed).

In addition, inspection and surveillance system is very necessary for preventive food control. USA, Canada, Australia and New Zealand, many European countries, Japan, Thailand, Indonesia and our neighboring country India are some of the examples those who started inspection emphasizing risks and surveillance system with scientific approach.

Government of Bangladesh has created Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) as an apex body for controlling food safety through the coordination among the existing Food Control Agencies (FCAs) by the enactment of Food Safety Act, 2013. With the help of development partner USAID through FAO, once BFSA tried to initiate the risk-based inspection system through scientific approach. Currently, JICA is supporting Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) for strengthening its capacity by a technical cooperation project.

However, followings are the challenge to implement preventive food control system:

- Lack of coordination among the Food Control Agencies (FCAs)
- No monitoring of other FCAs to support and follow-up their activities
- Overlapping of roles and activities of FCAs and no clear jurisdiction is identified
- Registration and licensing are done by other departments and authorities. However, food safety and hygiene status are not considered mostly in everywhere during issuing registration and license.
- BFSA does not have authentic data-base of FBOs because BFSA does not have any registration and licensing authority
- Standards, rules and regulations are overlapped among the FCAs
- Substantial mis-trust between the FBOs and regulators
- Mandatory vertical quality standards even the products manufactured by SMEs
- Frequent transfer of high officials and deputed officials are not relevant background in most cases.
- Fresh officers are not provided hands-on training on food safety.
- Application of Food Safety Act, 2013 through mobile court is contradictory to the science-based approach.

What is necessary?

- ✓ Regulatory gap analysis and arrange a high-level dialogue through the involvement of Cabinet Division
- ✓ Amendment of Food Safety Act, 2013 with the provision of registration and licensing, revisit the term sub-standard that is not related to food safety, increasing the administrative authority to bring it to court if any FCAs fails to comply BFSA's direction.
- ✓ Obsolete other agency's registration and licensing system if it is not relevant to food safety
- ✓ Coordinate among FCAs with demarcation of clear roles and responsibilities and regular monitoring of their activities through involvement of Cabinet Division if required
- ✓ Necessity of vertical quality standards need to re-think because we cannot stop product diversification and customer demand according to their food choices and health need unless there is any food safety issue. Does it require for SMEs??
- ✓ Involvement of Food industry expert in the development of rules-regulations and high-level technical committees
- ✓ Training strategy for hands-on training and refresher training. Minimum 1 Years hands-on training through attachment in industry and regulatory activities. In addition, refresher training is required with a certain interval
- ✓ High officials should be posted for a sufficient time until the successor get ready to take the lead and deputed officials shall be relevant background to comply with the FSA, 2013. Better to recruit the experienced-individual directly

Introduction of preventive control system emphasizing risk-based approach rather than reactive approach like mobile court.

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ

সাইফুল ইসলাম
গবেষক ও কৃষি অর্থনীতিবিদ

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা। তন্মধ্যে খাদ্য হলো মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান মৌলিক চাহিদা যা স্বাস্থ্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুস্বাস্থ্য জীবন ধারণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) ও ১৮(১) অনুচ্ছেদ এবং জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫/১ অনুযায়ী সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের বিষয়টিকে প্রধান্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ পুষ্টি পরিষদ গঠনের আদেশ স্বাক্ষরিত হয়। নিরাপদ খাদ্য বলতে প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় ও কার্যকর আইন জরুরি। বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের (ব্রি'র তথ্যমতে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪২ লাখ টন) দেশে পরিণত হলেও নিরাপদ খাদ্য তথা খাদ্যের মান নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। খাদ্য নিরাপত্তাকে পাশ কাটিয়ে এখন আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ খাদ্য। এদেশে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়ার দায় উৎপাদক থেকে শুরু করে মধ্যস্বত্বভোগী তথা মুনাফালোভীদেরই। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফসলের মাঠে কৃষকেরা মাত্রাতিরিক্ত সার, আগাছানাশক, কীটনাশক, বালাইনাশক, এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ইত্যাদি অপপ্রয়োগ করে। উৎপাদকের পাশাপাশি আড়তদার, মজুদদার, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাসহ মুনাফালোভীরা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক তথা সোডিয়াম সাইক্লোমেট, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, খাবারে সুগন্ধি, রং, পোড়া ও মবিলমিশ্রিত তেল, প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই অনিরাপদ খাদ্য রোগ ও অপুষ্টির একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে যা গর্ভবতী, নবজাতক, শিশু, কিশোর, বৃদ্ধসহ সকল বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে আমরা বরাবরই সর্বস্তরে উদ্বিগ্ন। খাদ্যের প্রধান উৎস শস্য, শাকসবজি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ। মাছ-মাংস, ফলমূল ও শাকসবজি কিনতে গিয়ে প্রায়ই দ্বিধায় পড়তে হয়। খাদ্যের রূপান্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ইচ্ছাকৃত বা অসাবধানতা অথবা অজ্ঞতাবশত অনিরাপদ হয়ে থাকে। খাদ্যপণ্যে ভেজালের কারণেই মানুষের বিভিন্ন রকমের রোগ যেমন গ্যাস্ট্রিক, ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনি ফেইলিউর, হৃদযন্ত্রের অসুখ, হাঁপানিসহ আরও জটিল রোগ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আর এ ব্যবস্থা নিরসনে সর্ব প্রথমে খাদ্যকে নিরাপদ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান কৃষি ও খাদ্যবান্ধব সরকার 'নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩' প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালে ২ ফেব্রুয়ারি গঠন করেছে 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'। এছাড়াও সময়ে সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা এবং প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ভোক্তা অধিদপ্তর নিরাপদ খাদ্য অভিযান পরিচালনা করছে। বিএসটিআই মান নিয়ন্ত্রণের লাইসেন্স প্রদান আর 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' মনিটরিং করে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ও তা সমন্বয়ের চেষ্টা করছে। সবাইকে ভেজালবিরোধী সচেতনতা ও আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদক থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। এ জন্য গণমাধ্যমকেও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার নিশ্চিতে অনেকটা পিছিয়ে আছে। আইসিডিডিআরবি -এর তথ্যানুসারে, পৃথিবীর প্রায় ১৫০ মিলিয়ন পাঁচ বছরের নিচের শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এর মধ্যে প্রায় ৬ লাখ শিশু তীব্র পুষ্টিহীনতায় এবং ৪৩ শতাংশ পাঁচ থেকে ছয় বছরের শিশু অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। আর ২৮ শতাংশ শিশু বয়সের তুলনায় উচ্চতা অনেক কম অর্থাৎ খর্বাকৃতি, ১০ শতাংশ শিশু উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক কম অর্থাৎ ক্ষীণকায় এবং ২৩ শতাংশ

শিশু অস্বাভাবিক কম ওজনের হয়ে থাকে। অন্যদিকে, প্রায় অর্ধেক নারী অ্যানিমিয়ায় ভুগে থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর লক্ষ্য হলো অনিরাপদ খাবারের সাথে যুক্ত জনস্বাস্থ্যের হুমকি প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং প্রতিক্রিয়া জানানো। ভেজাল উৎপাদন উপকরণের জন্য কৃষকের পক্ষে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা বড় চ্যালেঞ্জ। উদ্যোক্তা ও ভোক্তা উভয়েই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিপদে থাকেন। উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণনের প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায়

ক) খাদ্য উৎপাদনে ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান যেমন আগাছানাশক, কীটনাশক, এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, ভারী ধাতু ইত্যাদি ব্যবহারে কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

খ) খাদ্য উৎপাদনে বায়ো-ফার্টিলাইজার, বায়ো-পেস্টিসাইড, জৈব বালাইনাশক, ফেরোম্যান ট্র্যাপ, পার্চিং, নিরাপদ সংরক্ষক ইত্যাদি নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;

গ) নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে লাগসই প্রযুক্তি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা;

ঘ) বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক উপকরণ ভর্তুকির মাধ্যমে সরবরাহ করে সহজলভ্য করা; ও

ঙ) সমবায় চাষাবাদ পদ্ধতিতে ফসল সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম ও নির্মাণ এবং পরিবহন ব্যবস্থা করা।

২. প্রক্রিয়াজাতকরণ, সরবরাহ, বিপণন ব্যবস্থায়

ক) নিরাপদ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

খ) উৎপাদিত খাদ্যের বিবরণ ও ব্যবহৃত উপাদান, পুষ্টি ও বিশেষ পথ্যগুণ এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি/পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি মোড়কে নিশ্চিত করা;

গ) ব্যক্তি বা কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপনে সহায়তা করা;

ঙ) বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সংরক্ষণের অবকাঠামো গড়ে তোলা;

চ) গুণগত মানসম্মত খাদ্যের ব্র্যান্ড সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা; ও

ছ) নিরাপদ খাবার বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাজার কমিটি বা কমিউনিটি কর্তৃক সত্যায়িত নিরাপদ খাবার বিপণনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩. অর্থায়নে উৎসাহিতকরণ

ক) নিরাপদ খাদ্য গবেষণা ও সম্প্রসারণে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা;

খ) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিশেষ তহবিল গঠন করা;

গ) 'ভ্যালু চেইন' ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চালু করা; ও

ঘ) নিরাপদ খাদ্যে সহজলভ্য এবং স্বল্প সুদে ঋণ পাবার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করা।

৪. বাজার বা পরিবহণ ব্যবস্থায়

ক) দেশের সকল বাজারের ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

খ) নিরাপদ খাদ্য বিক্রয়কেন্দ্র বা বাজার তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা;

ঘ) নৌপথ, রেলপথসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ও অগ্রাধিকারমূলক পরিবহন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা; ও

ঙ) পথখাবারের দোকান, খুচরা বিক্রেতা, হোটেল, রেস্তোরাঁসহ খাদ্য পরিবেশনে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৫. আইন, বিধি ও প্রয়োগে

ক) উৎপাদনকারী, মধ্যসত্বভোগী ও ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা;

খ) কমিউনিটি সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা তৈরি করা;

গ) বাজার ও ভোক্তা পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সহজলভ্য করা;

ঘ) প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ভোক্তা অধিদপ্তর ও বিএসটিআই কর্তৃক অভিযান পরিচালনা এবং হাট-বাজারভিত্তিক কমিটি গঠন করে নিরাপদ খাদ্য বিপণন তদারকি করা; ও

ঙ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি 'হটলাইন সেবা' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধির পাঁচটি মূলনীতি হলো:

১. মানুষ, গৃহপালিত প্রাণী ও কীটপতঙ্গ থেকে রোগজীবাণু খাদ্যে সংক্রমণ হওয়া প্রতিরোধ করা;

২. কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা করে রাখা যাতে রান্না করা খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ না হতে পারে;

৩. পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের সময় ধরে ও যথাযথ তাপমাত্রায় খাদ্য রান্না করা যাতে খাদ্যের রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়;

৪. সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা; ও

৫. নিরাপদ পানি বা জল ও নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার করা।

অনিরাপদ খাদ্যকে খাদ্য বলা যাবে না। ভেজাল খাদ্যে মানুষ শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক মানসম্মত না হওয়ায় রপ্তানি করতে গিয়ে বারবার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সময়ে সময়ে নির্দেশনা, আইন, বিধি-প্রবিধি প্রণীত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন করতে গেলে নিরাপদ খাদ্য দরকার। নিরাপদ খাদ্য একটি সবল জাতি গঠন তথা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

“নিরাপদ খাবার সবার অধিকার”

সালেহ্ আকরাম আকন্দ
গবেষণা কর্মকর্তা
খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়

মানুষ বা প্রাণি যা খায় তাই খাদ্য নয়। খাদ্য হচ্ছে যেসব বস্তু বা দ্রব্য যা আহার করলে, আহার্য বস্তু হজম হয়ে বিশোষিত হবে এবং বিশোষণের পর রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে শরীরের প্রয়োজনমত কাজে লাগবে। দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে, শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখবে। খাদ্য হিসেবে মাটির বিস্কুট এখনো আফ্রিকার অনেক দরিদ্র দেশ খেয়ে থাকে। ৭০-৯০ এর দশকে বাংলাদেশের মানুষও ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে মাটির বিস্কুট খেত। বিষয়টি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এই বিখ্যাত পোড়ামাটির বিস্কুট তৈরি হত হবিগঞ্জসহ সিলেট এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বেশ কিছু অঞ্চলে। তবে এই বিস্কুট খাওয়া হত ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ সিলেট অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে এই বিস্কুট কে ডাকা হয় ছিকর বিস্কুট নামে। ছিকর, শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ ছিয়াকর থেকে। যার বাংলা করলে দাড়ায়, কালো মাটি। সিলেট অঞ্চলের মানুষের ধারণা ছিল, গর্ভবতী নারীদের কাছে ছিকর অতি পছন্দের খাবার ছিল। এটি খেলে নাকি রোগ-বালাই হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। সেইসঙ্গে পেটের বাচ্চা সুস্থ থাকবে। যদিও এই ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা প্রমাণ আছে কিনা তা জানা যায়নি। সময়ের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে যা এখন শুধুমাত্র খাদ্যতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং নিরাপদ খাদ্য স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ অনুসারে ‘‘নিরাপদ খাদ্য’’ অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য”। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শুধু খাদ্যের থেকে নিরাপদ খাদ্য বেশি গুরুত্বপূর্ন। করোনা মহামারিতে সারাবিশ্বব্যাপি বিভিন্ন দেশে খাদ্য শৃঙ্খলে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশকেও এ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নিরাপদ খাদ্য প্রবাহ নিশ্চিতে অনেক বেগ পোহাতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য ও বাংলাদেশ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির আলোকে বাংলাদেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারের গৃহীত আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিত্তিক সমন্বিত নীতি-কৌশল ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং কৃষি প্রণোদনার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ চলতি দশকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির টেকসই উন্নতি সাধন করেছে। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বহুগুণে বেশি। জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু ক্যালরি প্রাপ্তির নিরিখে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা বর্তমানে টেকসই ও স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস এই ইঙ্গিত বহন করে যে, সময়ের সাথে সাথে দেশে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন করেছে এবং ২০১৮ সালে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রাথমিক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম করেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়ও, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; যেমন: পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা ‘ক্ষুধা’ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-২০১৯ সময়ে গড়ে ১৩% এ উপনীত হয়েছে। একইভাবে, ২০০৪ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ৫১%, কৃশতার হার ১৫% এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে যথাক্রমে ২৮%, ৯.৮% এবং ২২.৬% হয়েছে। এগুলো সাম্প্রতিককালে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে দেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পর্যাপ্ত খাদ্য চাহিদা মেটানোই যেখানে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিলো সেখানে নিরাপদ খাদ্যের প্রসঙ্গটি নিয়ে তাই ভাবার সুযোগ কম ছিলো কিন্তু আজ বাংলাদেশ মানুষের খাদ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেছে বিধায় নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। সুস্থ জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে যার কার্যক্রম এখন পর্যন্ত ৬৪ টি জেলায় বিস্তৃত করা হয়েছে এবং তারা জেলা উপজেলা পর্যায়ে সভা সেমিনার, পোস্টারিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ও খাদ্য উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে সর্বস্থরে নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বার্তা প্রদান করছে। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং সুস্থ জীবনের জন্য কোন কোন খাদ্যে কোন কোন উপাদান কি কি পরিমাণে থাকা উচিৎ তা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে প্রচার করছে। 'বাংলাদেশ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' সুনির্দিষ্টভাবে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ এর কৌশল ৩.১ এ টেকসইভাবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের কথা বলা হয়েছে এবং এতে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কৌশল ৩.২ এ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহ দানের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং কৌশল ৩.৩ এ নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। কৌশল ৫.১ এ খাদ্যের নিরাপদতা উন্নতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেয়া । নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে 'গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাক্টিস' গ্যাপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে ফলে অপুষ্টির ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সবার জন্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রয়াস হাতে নিয়েছে এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ তৃতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা-খাদ্য মন্ত্রণালয় টেকসই ও স্থিতিস্থাপক খাদ্য পদ্ধতি (সিআইপি-৩, ২০২১-২০২৫)' প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়াও সংবিধানের ১৮(১)নং অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে পুষ্টি ও জনস্বাস্থের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পৃক্ত যার ফলেই সরকার সর্বস্তরে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে।

টেকসই উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য

মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার,এমপি 'ফুড সিস্টেম সামিট-২০২১' এ বলেছেন টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত , নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা। একটা জাতি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। শুধু খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়, খাদ্য হতে হবে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। মানুষকে সুস্থ ও সবল হয়ে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের পুষ্টিগুণ বজায় রাখা অপরিহার্য। সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে সেই পুষ্টিসম্মত খাবার গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, সরু চাল, বড় মাছ, মাংস ও বিদেশী দামী ফলমূলের যে গুণ; ঠিক মোটা চাল, ছোট মাছ, দেশীয় কমদামী শাকসবজি, ফলমূলেরও একই গুণ। যারা নিম্ন আয়ের মানুষ, তারাও পুষ্টিগুণ বজায় রেখে খাবার গ্রহণ করতে পারে। এখানে ইচ্ছাটাই বড় কথা। মানুষকে সুস্থ ও সবল থাকতে হবে। জাতি যদি সুস্থ-সবল না হয়, সুস্থ সমাজ গঠনও সম্ভব নয়। সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবা অবান্তর।

এসডিজির লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সবার জন্য অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই তারা যথেষ্ট সচেতন হলেই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা যাবে। কেবল সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে পারলেই মানুষের মধ্যে অসংক্রামক রোগ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে এবং সুস্থ জীবন নিশ্চিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিটি মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারলেই সুস্থ সবল জাতি গড়ে উঠবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ অধিক কর্মক্ষম হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। তাই জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অবশ্যই সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম মানুষ সর্বোচ্চ অবদান রাখবে।

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক

Abul Kader Fakir
Scientific Officer
IMMM, BCSIR, Joypurhat

ভূমিকা: নিরাপদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। খাদ্যকে স্বাভাবিক এবং ভেজাল ও অন্যান্য দূষণ থেকে নিরাপদ অবস্থায় বিতরণই হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য। বিশ্বব্যাপী সব সরকারই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। কারণ বেঁচে থাকার রসদই হচ্ছে খাদ্য।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ বা খাদ্য সুরক্ষা বলতে খাদ্যবাহিত অসুস্থতা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে খাদ্য ব্যবহার, প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বিদ্যাকে বোঝায়। ইতিমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইনের জন্য 'নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা-২০১৪!! করা হয়েছে। এতে খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশানোর দায়ে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদন্ড ও ২০ লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। ২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদে নিরাপদ খাদ্য বিল পাস হয়।

এছাড়া লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে গম ও ভুট্টার উৎপাদন গত বছরের তুলনায় কম হবে। এ বছর ৪ কোটি ৮৪ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ২৩ লাখ টন বেশি। আমদানি পর্যাপ্ত নয় বিদেশ থেকে আমদানির জন্য এ পর্যন্ত ১১ লাখ ৮০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানির চুক্তি হয়েছে।

কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা করে রাখা, যাতে রান্না করা খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ না হতে পারে। পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের সময় ধরে ও যথাযথ তাপমাত্রায় খাদ্য রান্না করা, যাতে খাদ্যের রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা। নিরাপদ পানি বা জল ও নিরাপদ কাঁচামাল ব্যবহার করা।

সুস্বাস্থ্য ছাড়া জীবনের সকল অর্জনেই বৃথা। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য। অর্থাৎ সুস্থ খাবার, সুস্থ জীবন। যে খাদ্য দেহের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ করে তাই স্বাস্থ্যসম্মত বা নিরাপদ খাদ্য।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: উৎপাদনের পরিবেশ খাদ্যের মানকে প্রভাবিত করে। বাজারের তাজা মাছ কোন পরিবেশে বড় হয়েছে, সেটি কিন্তু মাছের গুণগত মান নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। মাছকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা থেকেও মানুষের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। এ জন্য উৎপাদনের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করতে হবে। নতুবা ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যাবে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে আমাদেরকে নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১। কৃষকদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সচেতন করতে হবে।

২। যথাযথ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া ফসলে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৩। খাদ্যের মান অক্ষুন্ন রাখতে সরবরাহকারীকে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

৪। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৫। খাদ্যে ভেজালকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৬। নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

৭। খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিক্রয় ও ভোক্তার খাদ্য গ্রহণ প্রতিটি স্তরে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে

৯। ফরমালিনসহ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

১০। খাদ্যের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, স্বচ্ছতা ও দেশপ্রেমের সাথে কাজ করতে হবে।

১১। নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সর্বস্তরে গণসচেতনতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে।

১২। খাদ্য উৎপাদনকারী শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি: খাবারের মধ্যে এনজাইমের ক্রিয়া, জীবাণুর বৃদ্ধি, পোকামাকড়ের আক্রমণ, আলো, অক্সিজেন, তাপমাত্রা, শুষ্কতা এমনকি কাটা, ফাটা, ও থ্যাঁতলানো ইত্যাদি কারণে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ধরণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সঠিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিত। খাদ্য পচনশীলতার ভিত্তিতে তিন রকমের হয়ে থাকে, যথা:

১. দ্রুত পচনশীল: মাংস, দুধ, পাকাফল।

২. আংশিক পচনশীল: মাটির নিচে জন্মানো ফসল-আলু। কলা, সবজি, বেকারির খাদ্য।

৩. অ-পচনশীল খাদ্য: শস্যজাতীয় খাদ্য- ডাল, চিনি, মসলা, শুকনা খাবার ইত্যাদি।

পচনকাজে সাহায্য করে এমন সব বিষয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন করা গেলে খাদ্য অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষন করা যায়। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন-

ক) শুষ্ককরণ: খাদ্যবস্তু থেকে পানি শুকিয়ে নিয়ে তা সংরক্ষণ করা যায়। এতে খাদ্যের ছত্রাক, জীবাণু ও এনজাইম প্রতিহত হয় এবং কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াই খাদ্য অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে বড়ই, খেজুর, আঙুর ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।

খ) হিমায়িতকরণ: সঠিকভাবে ঠান্ডা করলে খাদ্যের পুষ্টিমান, রং ও গন্ধ অটুট থাকে। তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলে খাদ্য দ্রব্যকে প্রথমে ভালো ভাবে পরিষ্কার করা দরকার। জীবাণু বৃদ্ধি ও এনজাইমের ক্রিয়া রোধ করার জন্য তিন,চার মিনিট ফুটন্ত পানিতে ভাপিয়ে নিয়ে তারপর ঠান্ডা পানিতা তা কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে এরপর পানি ঝরিয়ে তা বায়ুশূন্য পলিথিন ব্যাগে মুড়ে বরফের মধ্যে রাখতে হবে।

গ) রেফ্রিজারেশন ও ফ্রিজিং:
রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা ৪.৪ থেকে ১২.৮ সেলসিয়াসে থাকে। এতে খাদ্যের পানি ও রস বরফে পরিণত হয়না। তাই খাদ্য স্বল্প মেয়াদে ভালো থাকে।

ঘ) উচ্চতাপ প্রয়োগ: দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য সংরক্ষণ করতে চাইলে উচ্চতাপ প্রয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা সবচেয়ে ভালো। এতে জীবাণু কোষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

ঙ) পাস্তুরণ: এই পদ্ধতিতে অল্প তাপে খাদ্যবস্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করা ও খাদ্যের বিশেষ পরিবর্তন ছাড়া কিছু সময় ধরে খাদ্য সংরক্ষণ করা পাস্তুরণের মূল উদ্দেশ্য। দুধ, জুস, বিয়ার ইত্যাদি পানীয় এই পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

চ) বোতলজাতকরণ: কম অম্লযুক্ত খাদ্য একশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখলে টিনজাত খাদ্যের জীবাণু ধ্বংস হয়। এতে একটি মাধ্যম। ব্যবহার করা হয়- ফলের রস, চিনির সিরা, তেল, লবণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে।

ছ) চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ: ঘন চিনির সিরায় খাদ্যের পানির ক্রিয়া হ্রাস পায়, ফলে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে জ্যাম, জেলি, মারমালেড ইত্যাদি তৈরি করে অনেকদিন পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায়।

নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি: নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে জনগনকে নির্মোক্তভাবে উৎসাহীত করা যেতে পারে। যথা:

১) সাধারণ মানুষ যাতে করে খোলা খাবার না খায়, সে বিষয় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২) খোলা খাবারের ক্ষতিকর দিকগুলো সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৩) নিরাপদ খাবারের বিষয় বিভিন্ন সেমিনার বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

৪) অস্বাস্থ্যকর খাবারের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতে দিতে হবে।

৫) অস্বাস্থ্যকর খাবার যাতে করে বিক্রেতা বিক্রয় করতে না পারে তার উপর কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার:

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। ফসলে কীটনাশক, মাছ চাষে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহৃত হলে সেখান থেকেও পানি ও মাটি দুষিত হতে পারে। দূষতি বা জীবাণযুক্ত পানিতে বেড়ে উঠা মাছ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আবার জৈব বা অর্গানিকের নামে আমরা যেসব অশোধিত পশুপাখির মল ও বিষ্টা ব্যবহার করছি তা থেকে জীবাণু ও ক্ষতিকর পদার্থ খাবার ও পানির মাধ্যমে মানুষে সংক্রমিত হতে পারে। তাই প্রকৃতি সুরক্ষা করতে এখনই আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

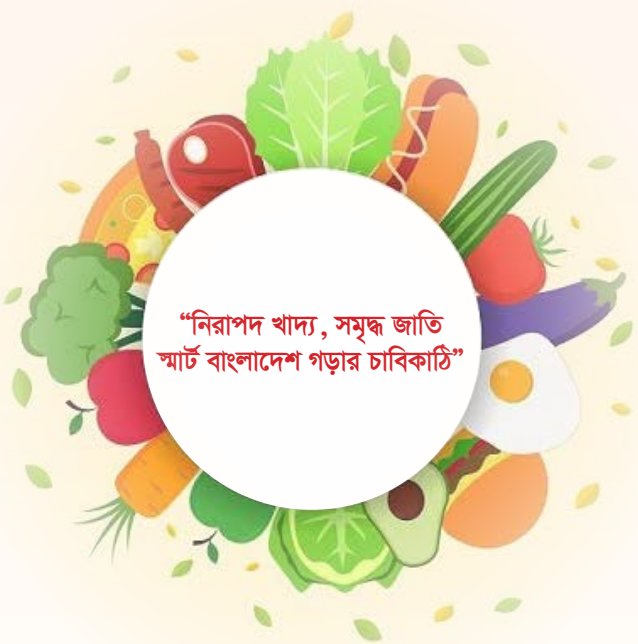

PREVENTIVE CONTROL MEASURES FOR FOOD ADULTERATION AND ALLERGEN

Md. Nazimul Islam
Deputy General Manager- Product Development & Quality Control
ACI Foods Ltd & Rice Unit

Adulteration of food is the process of adding unwanted substances to the food, with similar appearance/color for making profits which makes that food product fails to meet the legal standards. Adulterants are poor quality products added to food items for economic and technical benefits, which reduce the value of nutrients.

The Food Risk matrix

Fraudulent, intentional substitution or addition of a substance in a product for the purpose of increasing the apparent value of the product or reducing the cost of its production.

Criminal act executed by individuals who defraud the public for economic gain.

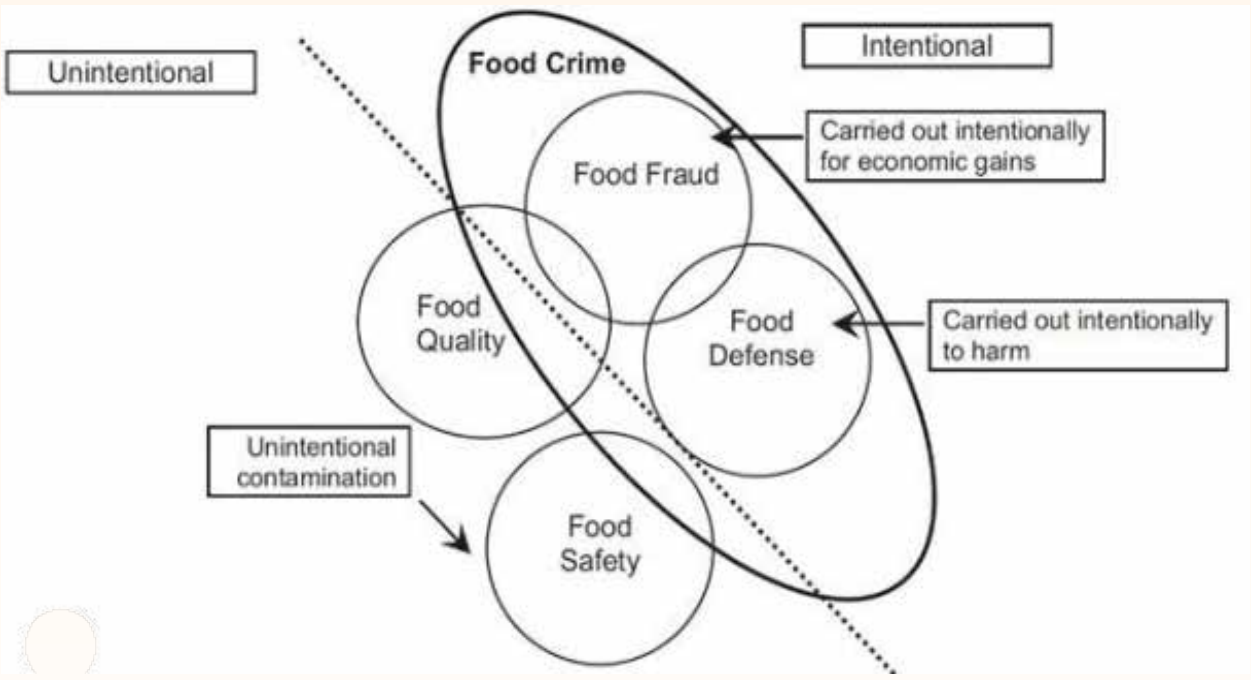

Types of adulteration in food

- **Intentional Adulteration:** Adding adulterants intentionally to increase the food's weight and gain more profit.
- **Incidental Adulteration:** Occurs due to carelessness while handling food.

- **Metallic Adulteration:** Accidentally or intentionally adding metallic substances.
- **Packaging Hazard:** Packing materials can also interfere and mix with food ingredients.

Risk Type	Example	Cause and Motivation	Public Health Risk Type	Secondary Effect
Food Quality	Accidental bruising of fruit	Mishandling	None, or possible food safety	Reduced equity or food safety incident
Food Fraud	Intentional adulteration of milk with melamine	Increased profit margins	None, or possible food safety	Public fear and lower prices industry- wide
Food Safety	Unintentional contamination of raw vegetables with E. coli	Limited control during harvesting and processing	Food safety	Damaged industry, recall expense, and public fear
Food Defense	Intentional contamination of ground beef with nicotine	Revenge against the store/manager through injury to consumers	Food defense	Damaged industry, recall expense, public fear

How to control Food Adulteration?

1. Steps to take care of while transporting and warehousing food products:

Insect infestation due to the humid and unhygienic conditions of the warehouse is the huge threat for food grains, legumes and spices. To resolve this problem, professional individuals should closely monitor the storage conditions and check that infested grains from fields do not reach warehouse and become a threat for healthy grains. To improve the quality of grains, they should keep a track of incoming and outgoing samples along with their dates. During the monsoon season and in highly humid areas, extra care must be taken to prevent spoilage of grains. Design a warehouse with proper storage environment which minimize the risk of contamination.

2. Steps to take care of while processing food products:

To prevent the outbreaks of *Salmonella, E. coli* certain Food Safety Standards and Regulations should be adhered. Facility location should be designed to avoid pest “hot spots” and pollution areas. Machinery design should be up to the sanitizing and cleaning protocols. Invest in Pest control monitoring and detection. Proper waste disposal should be the priority to avoid risk of contamination. Personal and environment hygiene should be benchmarked properly.

3. Steps to take care of while packaging food products:

Packaging material should protect against chemical and microbial contamination. The ink used on package should be free from hazardous substances. Proper labelling of food items including allergen information should be done to eliminate product recalls. Personnel hygiene and good manufacturing facility should be the major priority. Food Packaging Regulations should be properly implemented.

Leading EMA (Economical Motivated Adulteration) Incidents by type of Adulteration & Location

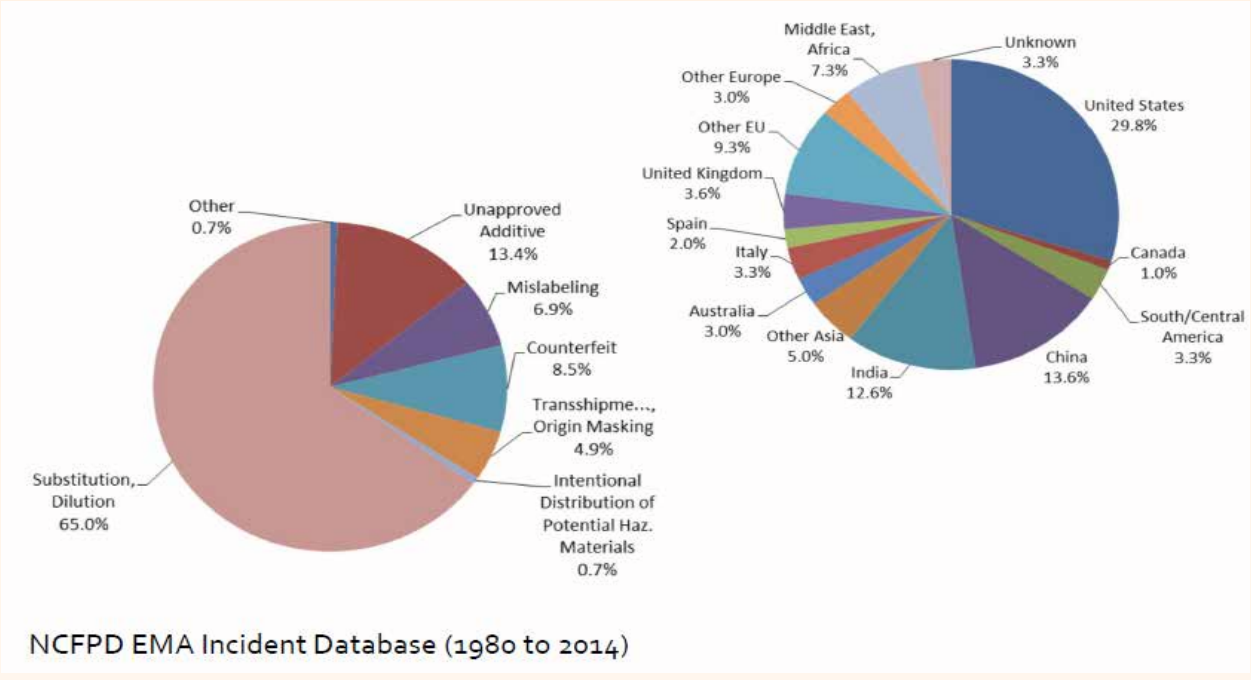

MITIGATION MEASURES FOR ADDRESSING FOOD ADULTERATION:

- There must be proper surveillance of the implementation food laws.
- There should be monitoring of the activities with periodical records of hazards regarding food adulteration.
- There should be periodical training programs for Senior Officer/Inspector/Analysts for food safety
- There should be consumer awareness programs organized by holding exhibitions/seminars/training programs and publishing leaflets.
- There should be strict actions regarding the punishment for those who are involved in food adulteration.
- There should be help and support from International INGOs for implementation of food laws.

Food Allergen

The *Preventive Controls for Human Food* regulation requires documented food allergen preventive controls to prevent allergen cross-contact and to ensure accurate allergen labeling is on finished food products. The need for specific food allergen controls is determined through the hazard analysis process. The specific allergen control practices required to manage food allergens depend on the specific product and manufacturing practices. The required elements of allergen controls in a Food Safety Plan, i.e., accurate labeling to inform consumers and preventing allergen cross-contact and the associated monitoring procedures are addressed. Hazard Analysis and Preventive Controls Determination describes the process of evaluating food allergen hazards to determine the allergen preventive controls that are required to be included in the Food Safety Plan.

Two elements related to allergen control:

1) The need for allergen labeling to inform consumers and
2) The need to control allergen cross-contact because other products do not contain allergen substances.

The *Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act* (FALCPA) mandates labeling for these food allergen groups if they are present in a food product, therefore these are the allergens that you would identify as hazards requiring a preventive control during the hazard analysis. When labeling a product containing a food allergen, the label must be specific to the allergen to inform the consumer who has an allergy to one food in a group. For example, if tree nuts are present, then the specific tree nut(s) must also be on the label. Similarly, individual species of fish and crustaceans must be labeled. If all products produced in a given facility have identical food allergen profiles, then the allergen program needs to address only proper labeling because allergen cross-contact is not an issue. Sometimes a supply-chain program may be necessary, depending on the source and complexity of ingredients used in the product. For example, almond ingredients may come from a facility that processes other tree nuts; it will be important that the supplier has controls to address labeling and allergen cross-contact.

Allergen preventive controls must document those procedures used to prevent allergen cross-contact when the hazard analysis process identifies allergens as hazards requiring a preventive control. Cleaning of equipment that is used to process different food allergens is typically a preventive control.

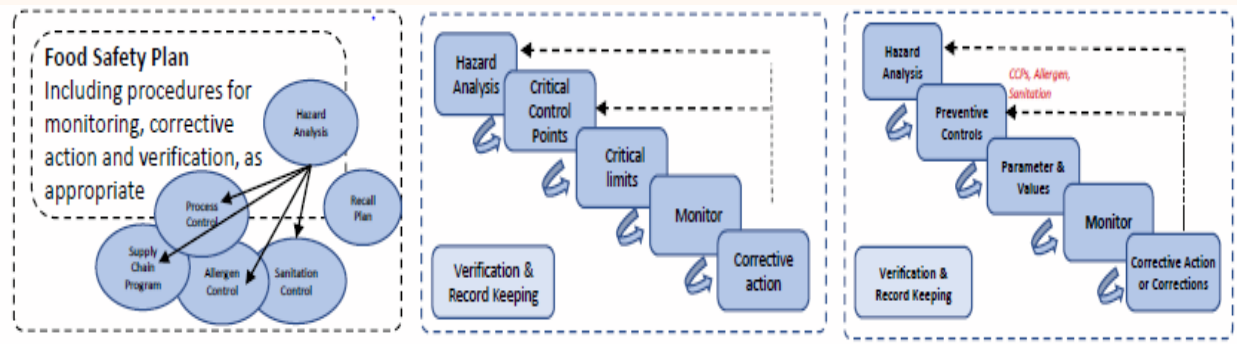

A master list of allergenic ingredients should be developed as part of allergen control. Frequently this can be managed by the individual in charge of developing and changing product formulations using information from supplier continuing guarantees. The list needs to be kept up to date, so it is important that any change information communicated from a supplier to the purchasing department, for example, gets to the person maintaining the master allergen list. Accessibility to the master allergen list at the loading dock is helpful so that allergenic materials can be placed in segregated storage. The master list should include the common name of the food allergen to ensure

that allergens are properly identified. For example, some ingredient names do not directly identify the allergenic material, such as sodium caseinate (which contains a milk allergen) or lecithin (which may contain a soy allergen). Staff training could include allergen identification and assessment of ability to clearly segregate allergens. The master list of allergenic materials should also consider packaging, processing aids, colors and flavorings.

Food Allergen Preventive Control Summery

1. Undeclared allergens present a risk:
    a. Consumer reactions can be severe
    b. Major cause of food recalls
2. Allergen preventive controls required to:
    a. Prevent allergen cross-contact
    b. Accurately label product
3. Allergen management best practices exist to:
    a. Protect the allergic consumers
    b. Reduce a company's risk
    c. Make food safer for all to enjoy

Food Safety Plan is required to Preventive Control for Food Adulteration and Allergen

The Food Safety Plan is a dynamic document, which must be kept current if changes are made to the system or to equipment when new products are added, or new hazards are identified. The schematic above illustrates that the Food Safety Plan includes a number of elements. It starts with hazard analysis, which is used to identify required preventive controls for the process, for sanitation, for food allergens and supply-chain programs, where these are needed to address the hazards requiring a preventive control. These elements, along with a recall plan make up the Food Safety Plan. Many GMPs and other prerequisite programs are managed outside of the Food Safety Plan. While these are separate programs and may not require the same level of documentation as the elements of the Food Safety Plan, they are important. They are generally managed using standard operating procedures with documents and records kept as appropriate.

How it's done at ACI Foods Limited

ACI Foods Ltd is a Food Safety Management System (FSMS) ISO 22000:2018 certified company. That's why all production process lines in the company are operated based on HACCP and GMPs standards. Apart from the HAZARD analysis ACI incorporated a Food Safety Preventive Control Alliance (FSPCA) "Qualified Individual" who has been trying to prevent some potential risks like ccp's, hygiene& sanitation, adulteration, allergen substances, and supplier authenticity.

ACI ensures safe food by performing physical, chemical, and microbiological tests with professional foods and chemical technologists.

"Warm wishes on the occasion of National Food Safety Day-2023 to everyone"

STRENGTHENING NATIONAL FOOD SAFETY SYSTEM: ADDRESSING THE PRIORITIES

Shahriar Ahmed
Regulatory Affairs Associate
Unilever Consumer Care Limited

Food safety is a fundamental public health requirement. There are several ways that food can become contaminated during food supply chain "from farm to fork." Despite the technological advances, revolution and innovations, the world still suffers from food-borne diseases, which affect human health and cause economic losses. Because of the evolving food safety systems, the existence of food hazards, and the changing in demographics and social life, there has been a huge demand in the country to find a system that ensures a safe food supply.

The food safety system and the regulatory framework in the country are still in their infancy. The new food safety authority is building the necessary systems and required resources, such as a skilled work force and testing infrastructure. The Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) was established in 2015 under the Ministry of Food as a result of Bangladesh's Food Safety Act 2013. BFSA is currently involved in coordinating among agencies, formulating rules and regulations, and establishing maximum residue limits (MRLs) for chemicals and other contaminants. The BFSA is in the process of addressing issues including inter-agency coordination, work force development, and infrastructure. In the meantime, it is important to consider the prevailing gaps and challenges in the existing scenario to efficiently address food safety risks and build a robust food safety system.

According to data source from World Bank, Bangladesh is now a lower middle-income country and can address following priority areas to strengthen national food safety system:

A. Policy, strategy, and regulation:

- Integrate food safety concerns into national strategies for agricultural transformation and trade diversification to mobilize attention.
- Align sanitary and phytosanitary standards with international standards with the potential for trade in relevant commodities.
- Develop a national multisector food safety strategy that sets priorities, addresses institutional strengthening and coordination, and lays out approaches for private sector collaboration and consumer engagement.
- In line with available enforcement and compliance capacity, strengthen the legal framework and align it with the Codex Alimentarius.
- Participate in regional harmonization efforts.
- Conduct cost-benefit analyses of proposed regulatory measures and incorporate regulatory impact assessments into policy making.

B. Risk assessment

- Set up programs for monitoring food consumption and purchasing patterns, and for estimating total dietary exposure to hazards.
- Develop a foodborne disease (FBD) surveillance and reporting system.
- Pay particular attention to microbial hazards, and hazards-related adulteration and use of agricultural inputs.
- Establish programs to monitor food safety hazards of public health concern and supplement them with studies to generate additional surveillance data to prioritize risks.
- Invest and facilitate investment in more extensive and professional quality assurance laboratory testing capacities
- Set goals of continuous reduction in FBD (as reported by surveillance system).
- Pay particular attention to emerging FBD and novel technologies.
- Draw up a national research plan to address food safety, with input from industry.

C. Risk management

- Develop a registry of food businesses in the formal sector and undertake risk profiling. Implement programs for the hygiene grading of food premises.
- Professionalize food inspectors and implement risk-based inspection plans.
- Introduce local good agricultural and animal husbandry practice programs targeting specific commodities in emerging formal sectors.
- Leverage consumer awareness and demand for safer food.
- Invest in (through public-private partnerships, if possible) improved food market infrastructure for perishable foods.
- Mainstream the adoption of good agricultural and animal husbandry practices through technical and market support programs, and ensure multisector synergies (through One Health, for example).
- Introduce procedures for investigating and responding to food safety incidents and emergencies, and for early warning systems.
- Strengthen border controls on a risk basis and ensure that controls follow good trade facilitation practices.
- Initiate efforts towards a ONE-HEALTH APPROACH

D. Information, education, and communication

- Implement national food safety awareness programs, targeting all stakeholders and age groups.
- Work with industry, consumer organizations and universities to develop training and advanced education programs in food safety management.
- Develop and implement various elements of a risk communications program, including guidelines for different stakeholders and use of electronic platforms.
- Support private efforts to label and certify products to promote consumer trust and reduce information asymmetry.
- Consider introducing a whistle-blower program.

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ে স্বপ্ন, সক্ষমতা ও সফলতা

মোঃ শাকিব হোসাইন
নিরাপদ খাদ্য অফিসার
হবিগঞ্জ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে রূপকল্প-২০৪১ এবং ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য' এই রূপকল্পকে সামনে রেখে ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছরই জাঁকজমকভাবে দিনটি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এবারের প্রতিপাদ্য- 'নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি'। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০২০ সালের শেষদিকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করেছে।

নিরাপদ খাদ্য নিয়ে কিছু বলার আগে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। গত দুই দশকে আমাদের দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে কর্মব্যস্ততা ও জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে। বিশেষত জেলা শহরগুলোতে মানুষ হোটেল রেস্তোরাঁ খাবারের প্রতি নির্ভশীল হয়ে পরেছে। এছাড়া হোটেল-রেস্তোরাঁয় দেশি বিদেশি নানা মুখরোচক পদের রান্না হচ্ছে। যার ফলে বাইরের খাবারের প্রতি ঝুঁকছে মানুষ। মানুষের খাদ্যতালিকায় যোগ হচ্ছে নতুন নতুন খাবার। ফলে জনস্বাস্থ্যে এর প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি বেকারি পণ্যের বাজার ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। ব্রেড, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, টোস্ট, ড্রাই কেক ইত্যাদির চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

সবগুলো বিষয় একসাথে তুলেধরা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবুও মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার কিছু অভিজ্ঞতা উল্লেখ না করলেই নয়। এরমধ্যে কয়েকটি খাদ্যে বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য। প্রথমত জনপ্রিয় বিভিন্ন নামে বিরিয়ানি ঘর নামে প্রতি জেলার আনাচে কানাচে কিছু দোকানে স্বল্প মূল্যে বিরিয়ানি বিক্রি করা হয়। দোকানগুলোর আশপাশ খাবারের সুঘ্রাণে মৌ মৌ করে। ঘ্রাণেই ক্ষুধার উদ্রেক করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের রান্না করার স্থান দোকান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। মনিটরিং এর সময়ে যেখানে বিভিন্ন ফ্লেভারিং এজেন্ট, রঙ ইত্যাদি পাওয়া যায়। যার অধিকাংশই অনুমোদনহীন। কোন কোন ক্ষেত্রে ফুডগ্রেড রঙ বা ফ্লেভার পাওয়া গেলেও এর কোন নির্ধারিত মাত্রা ব্যবহারকারীরা জানে না। যার ফলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এসব রঙ ও ফ্লেভারের ব্যবহার বাড়ছে প্রতিদিন। নামিদামি রেস্তোরাঁগুলোতেও নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এসব রঙ। কাচ্চি বিরিয়ানি, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিতে রঙ আনার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে টেক্সটাইল রঙ। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই রঙ ও ফ্লেভারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ।

মনিটরিং অথবা পরিদর্শনকালে হাতেনাতে এধরনের টেক্সটাইল রঙ বা অনুমোদিত কোন রাসায়নিক দ্রব্য পেলে সাথে সাথে তা বিনষ্ট করা হয়ে থাকে। লিফলেট, প্যাম্পলেট, নিরাপদ খাদ্য আইন এর পকেট বই বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এতে অনেকেই ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের শুধরে নিচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অন্যদের সাথে ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য অথবা অধিক মুনাফা লাভের আশায় পুনরায় আগের পন্থায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এরপর বলা যায় চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এর বিষয়ে। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে টেস্টিং সল্ট (মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট MSG) ব্যবহার করা হয় না এমন কোন পদ পাওয়া কষ্টসাধ্য। যদিও টেস্টিং সল্টের ব্যবহার নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন দেশে এটির ব্যবহার

নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার কোন কোন দেশ নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে ব্যবহারের বৈধতা রয়েছে। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হচ্ছে টেস্টিং সল্ট বিদ্যমান মুখরোচক খাবারগুলো নিয়মিত গ্রহণে আমাদের শরীরে ক্ষতিকর প্রভাবের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এই রাসায়নিক ব্যবহারের কোন জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ অধিকাংশ রাধুনির নেই বা থাকলেও সেই অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

এরপর আসা যাক পোড়া তেলের বিষয়ে। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলো এবং ভ্রাম্যমান ফুডকার্টে চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বার্গার, পিৎজা, স্যান্ডুইচ ইত্যাদি তৈরীতে প্রচুর পরিমাণ তেল প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে ব্যবসায়ী একবার তেল ঢেলে তিন থেকে চার দিন ব্যবহার করার কথা স্বীকার করে থাকেন। তেল উত্তপ্ত করার পর এত মধ্যে তৈরী হয় ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী ফ্রি-রেডিক্যাল। এছাড়া সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডহ নানা ক্ষতিকর গ্যাস তৈরী হয় যা এজমা, গ্যাস্ট্রিক, আলসারসহ নানা রোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। এই ক্ষতিকারক পোড়া তেল অনেক ক্ষেত্রে এই রেস্টুরেন্ট গুলোতেই পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে। অথবা রেস্টুরেন্টগুলো থেকে কোন এক মাধ্যমে ফুটপাতের খাবারের দোকানগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে। যেখানে এই পোড়াতেলগুলো নতুন তেল মিশিয়ে পুনরায় ফ্রাই করতে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং খাবারের সাথে আমাদের অন্ত্রে প্রবেশ করছে। পোড়াতেলকে খাদ্যশৃঙ্খল থেকে বিতাড়নের জন্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আরো কঠোর হস্তে এবিষয়টিকে নিয়ন্ত্রন ও দমন করা এখন সময়ের দাবি।

মিষ্টিপ্রিয় বাঙালিদের জিলাপি, রসগোল্লা তৈরীতে মিষ্টি তৈরীর কাই নরম করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে হাইড্রোজ ($Na_2S_2O_4$)। হাইড্রোজ মূলত আমদানি করা হয় টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহারের জন্য। ডাইং সেকশনে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয় এই হাইড্রোজ। সেই ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সাদা বর্ণের পাউডারের ব্যবহার বুঝে না বুঝে শুরু হয়েছে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মিষ্টির কারখানায়। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী প্রথম জিজ্ঞাসায় উত্তর দেয় এটি গ্লুকোজ বা বেকিং পাউডার। দেখতে একই হলেও খোলা প্যাকেটে বিক্রি হওয়া এই পাউডারের পাত্রের কাছে না নিয়ে যেতে তীব্রভাবে জানান দেয় যে, সেটি হাইড্রোজ। অতিরিক্ত মাত্রায় নিশ্বাসের সাথে নিলে ঘটতে পারে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি।

এই হাইড্রোজ আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যবহার করা হয়। আর সেটি হলো গুড়। এর প্রসঙ্গ যখন আসল এর সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। বাজারে আসলে প্রকৃত গুড়ের চেয়ে আসলে ভেজাল গুড়ের পরিমাণ অনেক বেশি। এই ভেজাল গুড় আসলে কী দিয়ে তৈরী হয় সেটা বিগত বছরগুলোতে আমরা বিভিন্ন অভিযান ও টিভি চ্যানেল প্রতিবেদনের মাধ্যেমে জেনেছি। তবুও যেটুকু না বললেই নয়, এই গুড় মূলত গোখাদ্য চিটাগুড় থেকে তৈরী হয়। এই চিটাগুড়ের কালার চকলেট থেকে প্রায় কালো বর্ণের হয়া যা গুড়ের রঙের থেকে ভিন্ন। এই রঙ থেকে গুড়ের রঙ আনার জন্য ব্যবহার করা হয় বিষাক্ত হাইড্রোজ। এই হাইড্রোজে গ্রহণে পাকস্থলির ক্যান্সার, কিডনি বিকলসহ নানা জটিল রোগ হয়। এর সাথে পরিমাণে বাড়ানোর জন্য ময়দা ও চিনি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও ফিটকিরি, বার্নিশ রঙসহ নানা ভেজাল মিশিয়ে নিম্নমানের গুড়/ অখাদ্য তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন বাসাবাড়ির মধ্যে রাতের গভীরে নেই কোন প্রতিষ্ঠানের নাম, নেই কোন ঠিকানা। এভাবে গুড় তৈরী করে হাট বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা আমরা না বুঝে অল্প দামে কিনে নিচ্ছি। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি আমরা ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলতে গেলে স্কুল কলেজের কথা বলতেই হয়। স্কুল কলেজের প্রবেশপথে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ঝালমুড়ি, ফুসকা, চটপটিসহ নানা অস্বাস্থ্যকর খাবারের দোকান। খাবারগুলো পরিবেশিত হচ্ছে খবরের কাগজে অথবা নন ফুডগ্রেড পাত্রে। এছাড়া এসব খাবারের সাথে একধরনের টক পানীয় খুবই জনপ্রিয়। যা খুবই নিম্নমানের তেতুল অথবা সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে তৈরী করা হয়। পরীক্ষাগারে এসব ফুসকা, চটপটিতে নিয়মিতভাবে মিলছে মানুষের মলের জীবাণু (E. coli). যা ভোক্তার দেহে প্রবেশ করলে রক্তবমি, ডায়রিয়া, আমাশয়, পেটের পীড়া সহ মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া এসব খাবার খেয়ে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ যেমন জন্ডিস, টাইফয়েডসহ নানা রোগ। কোন কোন ক্ষেত্রে তৈজসপত্রগুলো একই পানি দিয়ে বারবার ধোয়ার ফলে এবং একই প্লেট, চামচ বহুজন ব্যবহারের ফলে কমিনিকেবল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি হেপাটাইটিসের মত প্রাণঘাতী জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এই অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলে । এভাবে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্ম। এর থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্মিলিত পদক্ষেপ।

এরকম আরো অসংখ্য খুটিঁনাটি বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ব্যবসায়ীদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে তাদেরকে motivation এর মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দোষীকে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে মাত্র দুই (০২) জনের এই ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিতভাবে ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ, সচেতন ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিণীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। হোটেল রেস্টুরেন্টে কর্মরত মালিক, ম্যানেজার, খাদ্যকর্মীদের নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ

আয়োজন করে যাচ্ছে । ইতোমধ্যে আট(০৮)টি বিভাগ, চৌষট্টি ৬৪টি জেলা ও চারশত পঁচানব্বই (৪৯৫)টি উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। যাদের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। শহর থেকে গ্রামে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন টিভিসি, আয়োজন করা হচ্ছে পথনাটকের, গীতিনাট্যের। এছাড়া প্রতিটি জেলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মিনি ল্যাবরেটরি। বিভাগীয় ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার স্যারের দক্ষ নেতৃত্বে আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। অদূর ভবিষ্যতে সক্ষমতা ও লোকবল বৃদ্ধি এবং আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে সহজতর, লাইসেন্সিং এর এখতিয়ার প্রদান করলে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হবে বলে আশাকরি। হয়ত আর বেশিদিন বাকি নেই যেদিন খাবারকে আমরা দুষণ ও ভেজালমুক্ত করতে সক্ষম হবো। ক্ষেত থেকে পাতে খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। সেই সোনালী দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন ভোক্তা নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। একটি সুস্থ সবল ও সুন্দর জাতি পাবে এই দেশ। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ খাদ্যের নিরাপদতা অর্জন করবে।

মনিটরিং কালে খাদ্য প্রতিষ্ঠানকে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে

মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় খাদ্যকর্মীদের motivation কার্যক্রম

ROADS TO SAFE FOOD

S. M Shipon
Research Officer
Bangladesh Food Safety Authority

Safe Food, Safe Life
Fresh fruits and veggies, crisp and clean,
Pure water to drink, safe and serene.
Meats cooked to perfection, safe from germs,
No pesticides or chemicals, in our dreams.

Label reading, a must, for every meal,
No allergens, or additives, that's the deal.
Handwashing, a habit, before we dine,
To keep our food safe and fine.

From farm to plate, we take care,
To ensure our food is always fair.
Safe food, a right, not a privilege,
Let's work together, to make it the norm, let's pledge.

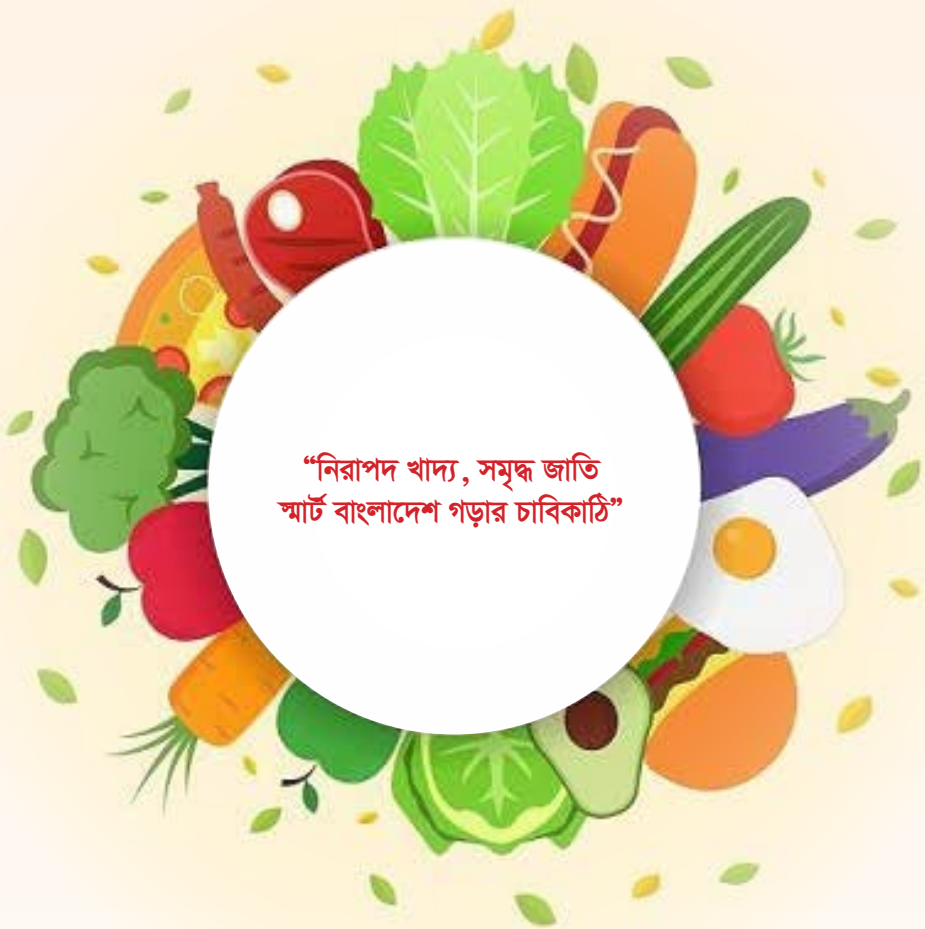

"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"

ফটো স্টেশন

শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯'- এর শুভ উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২১' এর উদ্বোধন ও দিক্-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

'সুস্বাস্থ্যের মূলনীতি, নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯' উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা।

পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত 'পারিবারিক নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

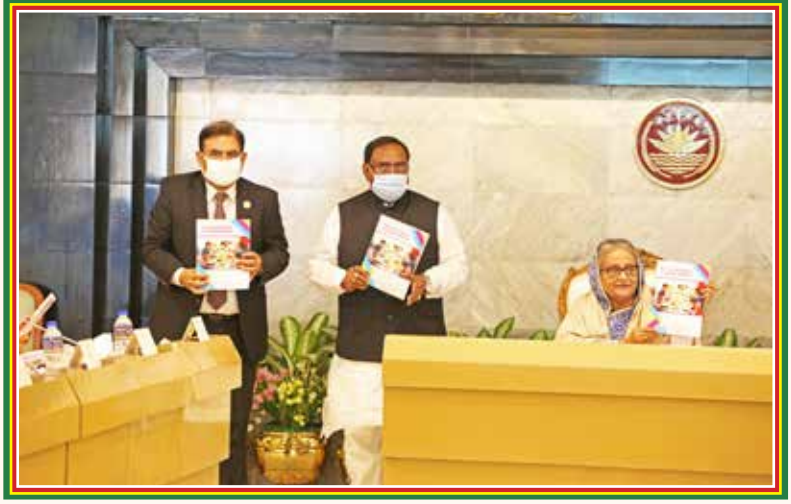

'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকার ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি, খাদ্যসচিব জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি ও বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি-কে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত 'নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা' প্রদান করেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা কর্তৃক মোড়ক উন্মোচিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" বইটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী মহোদয়কে প্রদান করা হয়।

'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২' উপলক্ষে বিয়াম মিলনায়তনে আয়োজিত সাইন্টিফিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিএফএসএ ও বিটিএফ প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠেয় "ফুড এন্ড ক্যামিকেল ল্যাব এক্সপো-২০২২" এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিএফএসএ ও বিটিএফ প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠেয় "ফুড এন্ড ক্যামিকেল ল্যাব এক্সপো-২০২২"-এ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

বিএফএসএ'র প্রশিক্ষণ কক্ষে আয়োজিত 'গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য আইন এবং বিধি-প্রবিধি অবহিতকরণ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত খাদ্যসচিব, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বিএফএসএ চেয়ারম্যান।

তথ্য ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় খাদ্যের নিরাপদতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত খাদ্যসচিব, তথ্যসচিব, বিএফএসএ চেয়ারম্যান ও সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

‘নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা’র চূড়ান্তকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহ।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এঁর হাতে ‘নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা’ হস্তান্তর করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম।

‘নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য জনাব আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ জনাব মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস-কর্তৃক ‘নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক খাদ্য নির্দেশিকা’ বিতরণের স্থিরচিত্র।

জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), রাজশাহী মহোদয় কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা বিতরণ।

'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাবির সাবেক উপাচার্য জনাব আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিক ও সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

৩০ শে জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বিএফএসএ প্রশিক্ষণ কক্ষে আয়োজিত মূল্যায়নকৃত খাদ্যস্থাপনার গ্রেড প্রদান অনুষ্ঠানে গ্রেডিংযুক্ত স্টিকার প্রদান করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর কনিষ্ঠ সন্তান শহীদ শেখ রাসেল-এঁর ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটছেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার। এ সময় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া, ক্যান্টিন ও মেসে কর্মরত খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতিত্ব করেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর পল্লবী এলাকায় হাত ধোয়া ও পথশিশুদের মধ্যে নিরাপদ খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিদ্যানন্দের সহযোগিতায় রাজধানীর পল্লবী এলাকায় হাত ধোয়া ও পথশিশুদের মধ্যে নিরাপদ খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এক শিশু। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'Harmonization of Food Safety Regulations and Standards' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

বিএফএসএ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'Harmonization of Food Safety Regulations and Standards' শীর্ষক কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান Mr. Sanjay Dave.

৭ মার্চ 'জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস' উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ'র তিন সদস্য যথাক্রমে মোঃ রেজাউল করিম, শাহনওয়াজ দিলরুবা খান ও প্রফেসর ড. আব্দুল আলীম।

১৪ ডিসেম্বর ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ’র অন্যান্য কর্মকর্তারা।

১৬ ডিসেম্বর ‘মহান বিজয় দিবস’ উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সচিব আব্দুন নাসের খান-সহ অনেকে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণেন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

বিএফএসএ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর শেষে স্মারকপত্র হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার ও বিটিএফ-প্রজেক্ট এর চিফ অফ পার্টি জনাব মাইকেল জে. পার।

বিএফএসএ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের সাথে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার ও টুরিজম বোর্ডের প্রতিনিধি।

বিএফএসএ'র প্রশিক্ষণ কক্ষে আয়োজিত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সেশন পরিচালনা করছেন বিএফএসএ'র পরিচালক ড. সহদেব চন্দ্র সাহা।

খাদ্য নিরাপদতা এবং নিরাপদ খাদ্যের পারস্পরিক রপ্তানি বৃদ্ধি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে মত বিনিময় সভা শেষে স্মারক উপহার প্রদান করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব
মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ফিক্কি)' এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান
জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

সিলেটের গোলাপগঞ্জে আয়োজিত 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও বিধি-প্রবিধির প্রয়োগ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএফএসএ সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান।

‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২২’ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন খাদ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের সাথে আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি; বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. নাজমানারা খানুম, খাদ্যসচিব ও জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন, সভাপতি, এফবিসিসিআই এবং সভাপতিত্ব করেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান।

‘ফুড এন্ড ক্যামিকেল ল্যাব এক্সপো-২০২২’ আয়োজন উপলক্ষে Meet The Press অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার, সদস্য মোঃ রেজাউল করিম ও বিটিএফ প্রজেক্টের চিফ অফ পার্টি জনাব মাইকেল জে. পার।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ‘নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য জনাব প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমেদ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার এবং সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. আব্দুল আলীম, সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ।

'খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী এ বস্তু বিষয়ক কারিগরি কমিটি'র সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

আইসিডিডিআর,বি কর্তৃক আয়োজিত 'Risk Analysis in the Regulatory Process' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন Dr. Clare Narrod, Director, University of Maryland, USA ও মঞ্জুর মোর্শেদ আহমদ, সদস্য, বিএফএসএ।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

"Nutrition and Quality Assessment of Polished Rice Sold in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাজমানারা খানুম ও সভাপতিত্ব করেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত নবম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণের ইন হাইজ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

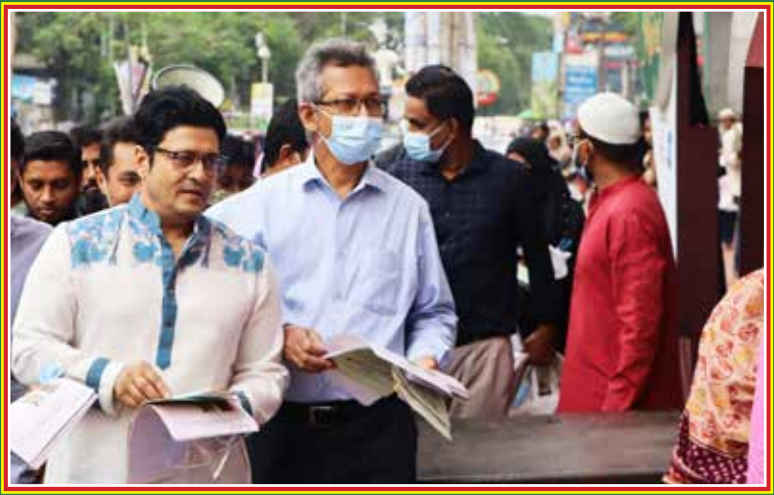

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রাজধানীর সাত মসজিদ এলাকায় নিরাপদ ইফতার প্রস্তুত ও বিক্রয় সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ নেন প্রখ্যাত চিত্রনায়ক জনাব ফেরদৌস আহমদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ সদস্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম।

রাজধানীর কাঁচাবাজারে বিক্রিত পণ্যসমূহের নিরাপদতা নিশ্চিত করার জন্য কাঁচাবাজার সতিমির নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম ও সমন্বিত মনিটরিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

রাজধানীর পল্লবি এলাকায় বিদ্যানন্দের সহায়তায় বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএফএসএ'র সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমদের নেতৃত্বে রাজধানীর চকবাজার এলাকায় পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে ইফতার প্রস্তুত ও বিপণনকারীদের কার্যক্রম তদারকি করছেন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং টিম।

বিএফএসএ প্রশিক্ষণ কক্ষে আয়োজিত “Preparatory Workshop on District Food Safety Annual Activity Plan” শীর্ষক কর্মশালা শেষে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

রাজধানীর পল্লবি এলাকায় বিদ্যানন্দের সহায়তায় বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন ঢাকা জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার জনাব তাহমিনা খাতুন।

সিলেট জেলার ঐতিহ্য পানসী রেস্তোরাঁয় মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রাজধানীর চকবাজার এলাকায় নিরাপদ ইফতার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের নিমিত্ত মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং অফিসার মোঃ আসলাম উদ্দীন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিলেট জেলার একটি রেস্তোরাঁয় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মাহবুব হাসান।

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিএফএসএ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার ও অন্যান্যরা।

সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্যের নমুনা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভ্রাম্যমান মোবাইল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করছেন কর্তৃপক্ষের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব এস এম শিপন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (আইন ও নীতি) জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান- এর বিদায় উপলক্ষে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ১৩-১৬তম গ্রেডের নব যোগদানকৃত কর্মচারীদের মাঝে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করছেন কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মো. রেজাউল করিম।

গাজীপুরের মৌচাকে ন্যাশনাল স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের 'ফ্যামিলি ডে'-তে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ।

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলায়। এতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরের ভাওয়াল রিসোর্টে বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত “Gastronomy Tourism in Bangladesh “ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সনদ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার।

গাজীপুরের মৌচাকে ন্যাশনাল স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ‘ফ্যামিলি ডে’- তে অনুষ্ঠেয় প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ খেলার পূর্বমুহূর্তে ফটোসেশনে অংশ নেন কর্তৃপক্ষের কর্মচারী একাদশ।

কোমলমতি / কচিকাঁচা পথশিশুদের নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে পাঠদান করাচ্ছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার জনাব মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪,৫,৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০
www.bfsa.gov.bd

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পথ খাবার ব্যবসায়ীসহ অনেক খাদ্য ব্যবসায়ী খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর মাধ্যমে ঝালমুড়ি, ফুচকা, সমুচা, রোল, সিঙ্গারা, পেঁয়াজু, জিলাপি, পরোটা ইত্যাদি পরিবেশন করছেন, যা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

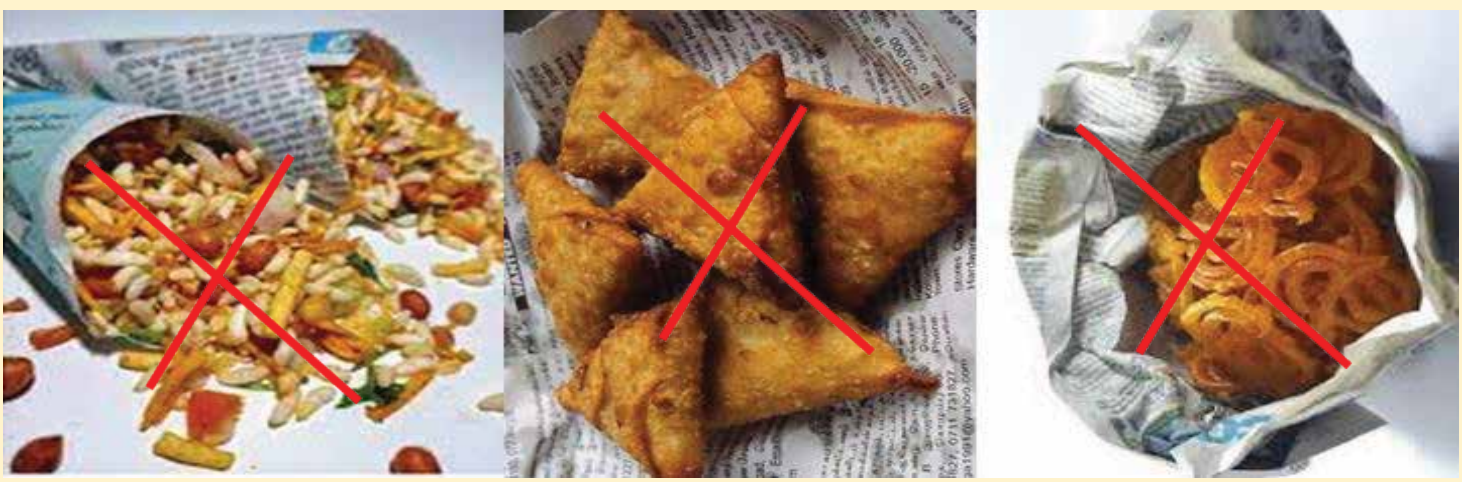

খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এ ব্যবহৃত কালিতে ক্ষতিকর রং, পিগমেন্ট ও প্রিজারভেটিভস থাকে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া পুরনো কাগজে রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবও থাকে। খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর ঠোঙায় বা উক্ত কাগজে মোড়ানো খাদ্য নিয়মিত খেলে, মানবদেহে ক্যানসার, হৃদরোগ ও কিডনীরোগসহ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

এমতাবস্থায়, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পথ খাবার ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ অনুসরণ করে পরিষ্কার ও নিরাপদ ফুডগ্রেড পাত্র ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

/polarbd | polarbd.com
info@polarbd.com

ANONYMEA

স্বপ্ন

উৎস থেকে উৎসবে

Hamdard
SINCE 1906

শরবত
রুহ্ আফজা®
৭৫০ মিলি
৩০০ মিলি

শত বছরের স্বাদ
শত বছরের আস্থা

• Increases energy & stamina
• Eliminates fatigue

Sharbat
Rooh Afza®

Rooh Afza Mint Lemonade
Rooh Afza Faluda
Rooh Afza Lassi
Rooh Afza Ice Cream

For more delicious Rooh Afza recipe please visit
www.roohafza.com.bd

সুন্দরবন থেকে আহরিত
প্রাকৃতিক
হামদর্দ
মধু

সেবন করুন
রোগ প্রতিরোধ
ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন

২৫০ গ্রাম
১০০ গ্রাম

Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh
Rupayan Trade Centre, Level: 12-13, 114 Kazi Nazrul Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000.
(02) 48311301-6 marketing@hamdard.com.bd www.hamdard.com.bd hamdardbd

Transcom
tradition in excellence

One of Bangladesh's largest
and most diversified conglomerates

KFC

"it's finger lickin' good"

order online
kfcbd.com
kfcbangladesh
kfcbd_official
kfcbangladesh

আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য
সেরা মানের উপাদানে তৈরি

রাঁধুনী

গুঁড়া মশলা

বিশ্বস্ত উৎস আর সযত্নে বাছাই করা সেরা উপাদানে তৈরি রাঁধুনী গুঁড়া মশলায় নিশ্চিত হয় আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য।

রাঁধুনী

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

খাঁটি মান, খাঁটি স্বাদ

বেঙ্গল মিট

পশু সোর্সিং থেকে রিটেইল পর্যন্ত

নিরাপদ মাংস নিশ্চিতে **বেঙ্গল মিট** অঙ্গীকারবদ্ধ

OPERATED
UNDER TECHNICAL
ASSISTANCE OF
AUSTRALIAN EXPERT

09678444555

bengalmeat.com

100% TRUST
The Coca-Cola Company
100% TRUST
বিশ্বস্ত কিন্‌লে পানি এখন
১০০%
রিসাইকেল্ড
প্লাস্টিক-এর
তৈরি বোতলে
রিসাইকেল করি
পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ি
কিন্‌লে
১০০%
কিন্‌লে
বিশ্বাস
প্রতি বিন্দুতে
Kinley is the registered trademark of The Coca-Cola Company.

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ চাবিকাঠি
মেনে চলি, সুস্থ থাকি

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়